গুরুত্বপূর্ণ সতর্কীকরণ

(যা প্রতিটি মুসলিমের জানা জরুরী)

সংকলন:
মোঃ আইয়ুবুর রহমান

ইসলামিক এ্যাডুকেশন ফাউন্ডেশন - তায়েফ
দক্ষিণ শাখা - ফোন: ৭৪০২২২৩ ফ্যাক্স: ৭৪০৬৬০৬।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কীকরণ

(যা প্রতিটি মুসলিমের জানা জরুরী)

সংকলন:

মোঃ আইয়ুবুর রহমান

ইসলামিক এ্যাডুকেশন ফাউণ্ডেশন - তায়েফ

দক্ষিণ শাখা - ফোন: ৭৪০২২২৩ ফ্যাক্স: ৭৪০৬৬০৬।

সূচীপত্র

محتويات الرسالة

নং	বিষয়	no	المحتويات	م
১	সূচীপত্র	2	الفهرس	١
২	ভূমিকা	4	مقدمة	٢
৩	মানুষের জীবনে ইসলামী আক্বীদার গুরুত্ব	6	أهمية العقيدة الإسلامية في حياة الإنسان	٣
৪	শির্ককারীর পরিনাম	7	خطر الشرك على صاحبه	٤
৫	বড় শির্ক ও ছোট শির্কের মধ্যে পার্থক্য	9	الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر	٥
৬	কবর যিয়ারত	9	زيارة القبور الشرعية والشركية	٦
৭	কাজে তাওহীদের প্রভাব	12	أثر التوحيد في الأعمال	٧
৮	কে খাঁটি মুসলমান ?	14	من المسلم الحقيقي	٨
৯	কতিপয় এবাদত	16	بعض أنواع العبادة	٩
১০	অজু ও তায়াম্মুম এর পদ্ধতি	19	صفة الوضوء والتيمم	١٠
১১	নামাযের গুরুত্ব ও ফজীলত	21	أهمية الصلاة وفضله	١١
১২	নামায পরিত্যাগকারীর বিধান	24	حكم تارك الصلاة	١٢
১৩	রোযা ও রামাযানের ফজীলত	28	فضل الصيام وشهر رمضان	١٣
১৪	হজ্ব ও উমরার ফজীলত	31	فضل الحج والعمرة	١٤
১৫	যাদু-টুনা	33	السحر	١٥
১৬	সুদ খাওয়া	36	أكل الربا	١٦

১৭	ঘুষ নেওয়া বা দেওয়া	38	أخذ الرشوة ١٧
১৮	মিথ্যা বলা বা সাক্ষি দেওয়া	40	الكذب وقول الزور ١٨
১৯	সমকামিতা ও স্ত্রীর পিছনের রাস্তা ব্যবহার করা	42	اللواط وإتيان المرأة في دبرها ١٩
২০	যেনা-ব্যভিচার	44	الزنا ٢٠
২১	মদ পান করা	47	شرب الخمر ٢١
২২	জুয়া খেলা	49	القمار والميسر ٢٢
২৩	চুরি ও ছিনতাই করা	51	السرقة وقطع الطريق ٢٣
২৪	পুরুষ মহিলার ও মহিলা পুরুষের বেশ ধরা	55	تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء ٢٤
২৫	খেয়াণত করা	57	الخيانة ٢٥
২৬	মুসলমানদের কষ্ট দেয়া ও গালি-গালাজ করা	60	أذى المسلمين وشتمهم ٢٦
২৭	মাপে বা ওজনে কম দেওয়া	62	نقص في الكيل والميزان ٢٧
২৮	ব্যবসায় ও কাজে ফাঁকি দেওয়া	64	الغش في العمل والتجارة ٢٨
২৯	মাহ্‌রাম নয় এমন মহিলার সাথে একাকী হওয়া	66	الخلوة بالمرأة الأجنبية ٢٩
৩০	গান-বাজনা শোনা	68	سماع المعازف والموسيقي ٣٠
৩১	শরীর ও পোষাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা	72	نظافة البدن واللباس ٣١

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা ও সমুদয় সুখ্যাতি, যাঁর অপার কৃপায় 'গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী' নামে বইখানার সঙ্কলন শেষ করতে পেরেছি। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর বংশধর এবং সকল সাহাবাগণের প্রতি।

কতিপয় মুসলমানের মধ্যে আক্বীদাহ্ ও মৌলিক বিষয়ে অনেক ভুলত্রুটি রয়েছে, এসব বিষয়ে উত্তম প্রতিষেধক মনে করে অত্র বইটি সংকলন করেছি। কেননা, এতে এমন কিছু বিষয় স্থান পেয়েছে যা মানুষ অধিকাংশ সময় ইচ্ছা অনিচ্ছায় করে থাকেন। তারা ভুলকে সঠিক, না-জায়েয কে জায়েয, হারামকে হালাল মনে করে এসব করে থাকেন। আবার অনেকে আছেন যারা না জেনে বা মন গড়া অনেক কিছু করে থাকেন।

অত্র বইয়ের মাধ্যমে সম্মানিত পাঠক ঐসমস্ত ভুল কাজ-কর্ম বা কথা-বার্তা থেকে নিজেকে এবং পরিবার ও সমাজকে সংশোধন করতে পারবেন ইন্শা-আল্লাহ। কেননা, সংকলন করতে গিয়ে অধিকাংশ বিষয়গুলোতে বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং কোরআন-হাদীছ থেকে বিভিন্ন ধরণের উপকারিতা, উলামাদের উক্তি ও কিছু ঘঁটনা একত্রিত করা হয়েছে। যাতে করে সম্মানিত পাঠক তাদের মধ্যে থাকা ভুল-ত্রুটিসমূহ বুঝতে ও সংশোধন করতে পারেন।

অত:পর আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি তায়েফ ইসলামী দা'ওয়া সেন্টারের সাউথ ব্রাঞ্চ এর পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ বিন দাখিলাল্লাহ আল-হারেছী কে, যিনি আমাকে অত্র বইখানা সংকলন করতে উৎসাহ দান করেছেন। এরপর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমার বন্ধুবর জনাব মোহাম্মদ হারুন হুসাইন কে, যিনি বইটিকে আদ্যন্ত সম্পাদনা করে আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন।

আরো ধন্যবাদ ও শুকরিয়া জানাই ঐ সব হিতাকাংখী দ্বীন-দরদী ভাইদের যাদের বদান্যতায় পুস্তিকাখানি বাংলা ভাষায় ছাপিয়ে বিলি করা সম্ভব হলো। আল্লাহ তাদের এই নেক আমল কবুল করুন!

নবীন লেখক হিসাবে কিছু ভুল থাকা বিচিত্র নয়। যদি কোন সুধী পাঠকের ভুলের প্রতি দৃষ্টিগোচর হয় এবং যথা সময়ে অবহিত করেন, তাহলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

পরিশেষে অত্র বইখানা দ্বারা সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সামান্য উপকৃত হলেই আমার এ শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব। হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষুদ্র খেদমতটুকু কবুল করুন। আমীন !!

বিনীত-
সংকলক
লিসান্স, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
মদীনা, সৌদী আরব।

মানুষের জীবনে ইসলামী আক্বীদার গুরুত্ব

আক্বীদাই হচ্ছে ইসলামের মূল বিষয়। ইহা আরবী শব্দ। যার অর্থ : বিশ্বাস বা বিশ্বাসস্থাপন করা। অতএব, মানুষের মূল বিষয়ই হচ্ছে আক্বীদাহ্। ইসলামী আক্বীদাহ্ না থাকলে মানুষ শিরকের অন্ধকারে ও দুনিয়ার লোভে পড়ে থাকে। ইসলামী আক্বীদার উদ্দেশ্য হচ্ছে- নিয়্যাতকে বিশুদ্ধ করা এবং এবাদত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা। অনুরূপভাবে জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনাকে বেহুদা ও উদ্দেশ্যহীনভাবে চলা-ফেরা থেকে মুক্ত করা এবং সর্ব বিষয়ে লক্ষ্য ও কর্মকে বক্রতা থেকে নিরাপদ রাখা।

ইসলামী আক্বীদার গুরুত্বঃ

◈ কারো মধ্যে ইসলামী আক্বীদাহ্ বিদ্যমান না থাকলে, তাকে গোমরাহী ও ভ্রান্ত আক্বীদায় জড়িয়ে পড়তে হয়।

◈ ইসলামী আক্বীদায় আত্মার প্রশান্তি ও চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়।

◈ ইসলামী আক্বীদাহ্ মু'মেন বান্দাকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকটে পৌঁছে দেয়।

◈ ইসলামী আক্বীদাহ্ জাতিকে মজবুত করে তুলে। কেননা নবী-রাসুলদের কাজই ছিল আক্বীদার বন্ধন মজবুত করা।

◈ ইসলামী আক্বীদাহ্ ব্যাক্তি ও সমাজকে সংশোধন করে দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যশীল করে তোলে।

বাস্তব চিত্রঃ

রাসুলের চাচা আবু জাহাল বা আবু লাহাব, তাদেরকেও জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহর নবীর চাচা হওয়া সত্বেও মুক্তি পাবে

না। কেননা, তাদের আক্বীদাহ্ ছিল ভ্রান্ত। অপরদিকে আমরা এ কালের সাধারণ মানুষ। রাসুলের সাথে আমাদের রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। তাই আক্বীদাহ্ ঠিক না করে কিভাবে মুক্তির আশা করতে পারি!

পরিশেষে আল্লাহর নিকট কামনা করছি, আল্লাহ্ যেন আমাদের ও সকল মুসলমানদের জীবনে ইসলামী আক্বীদাহ্ বাস্তবায়ণ করার তাওফীক দান করেন ! আমীন!!

শির্ককারীর পরিণাম

আল্লাহর সাথে যে শির্ক করা হয় তা সাধারণত: দুই প্রকার (ক) বড় শির্ক (খ) ছোট শির্ক। বড় শির্ককারীর এবং ছোট শির্ককারীর কি পরিণাম, তার বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। মূল কথা হল- বড় শির্ককারীকে আল্লাহ তওবাহ্ ব্যতীত মাফ করবেন না। আর ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

বড় শির্ক হচ্ছে- ঈমান কিংবা এবাদতে তথা তাওহীদে সৃষ্টিবস্তুর মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ النساء: ٤٨

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করলে তাকে ক্ষমা করবেন না তাছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন ; এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শির্ক করে সে মহাপাপে আবদ্ধ হয়েছে। (সুরা নিসা: ৪৮)

পক্ষান্তরে ছোট শির্ককারী শির্ক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না, তবে শাস্তিযোগ্য হবে।

ছোট শির্ক যেমন- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া, লোক দেখানো 'আমল' বা নাম ফুটানোর জন্যে কোন কাজ করা ইত্যাদী।

শিরকের অপকারিতা:

◈ শির্ককারী জাহান্নামে যাবে।

◈ শির্ক বড় জুলুম।

◈ আল্লাহ তওবা ব্যতীত শির্কের গুণাহ্ মাফ করবেন না।

◈ শির্ক করলে অন্যান্য আমল নষ্ট হয়ে যায়।

◈ শির্ক না থাকলে তাওহীদ বা একত্ববাদের মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়। যা ছিল জ্বিন ও মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য।

পাঠক! কোন প্রকার শির্ক যেন আমাদের দ্বারা না হয় সে দিকে খেয়াল রাখবেন।

বড় শির্ক ও ছোট শিরকের মধ্যে পার্থক্য

বড় শির্ক	ছোট শির্ক
◈ বড় শির্ককারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী।	◈ ছোট শির্ককারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না।
◈ বড় শির্ককারীর সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে।	◈ ছোট শির্ককারীর সকল আমল বাতিল হবে না।
◈ বড় শির্ককারীর জান ও মাল হালাল।	◈ ছোট শির্ককারীর জান ও মাল হালাল নয়।
◈ বড় শির্ককারীকে আল্লাহ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তওবা ছাড়া মাফ করবেন না।	◈ ছোট শির্করারীকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন বা শাস্তি দিবেন।

কবর যিয়ারত

ইসলামের প্রথম দিকে সকলের জন্যে কবর যিয়ারত করা নিষেধ ছিল। পরে তা শুধূ পুরুষদের জন্যে জায়েয করে দেয়া হয়েছে এবং মহিলা যিয়ারতকারিনীদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল লা'নত করেছেন. বিধায় মহিলাদের করব যিয়ারতে না যাওয়াটাই উত্তম। তাঁরা বাড়িতে থেকে বিভিন্ন এবাদত-বন্দেগী ও নামাযের পরে মৃতদের জন্য দোয়া করবেন।

রাসুল (সাঃ) বলেন:

أنه ﷺ قال: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة)) (أحمد ١٣٣٥) وفي مسلم ٩٧٦ ((فزوروا القبور فإنها تذكر الموت))

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা যিয়ারত কর। কেননা, তা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্বরণ করিয়ে দিবে। (আহমাদ ১২৩৫) এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনা এসেছে- তোমরা কবর যিয়ারত কর; কেননা তা মৃত্যুর কথা স্বরণ করিয়ে দেয়।

মহিলাদের কবর যিয়ারতে লা'নত সম্পর্কে রাসুল বলেন:

((لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور ...)) (أحمد ٢٠٣٠ والترمذي ٣٢٠ و أبوداؤد ٣٢٣٦)

((وقال ﷺ لعن الله زائرات القبور)) (ابن حبان ٣١٧٨)

অর্থঃ আবু দাউদ, তিরমিযী ও আহমাদের এক বর্ণনায়, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদেরকে লা'নত করেছেন। আর ইবনে হিব্বানের এক হাদীছে রাসুল (ﷺ) বলেছেন: আল্লাহ কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদেরকে লা'নত করেছেন।

অতএব একটু লক্ষ্য করুন! আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের লা'নত থাকা সত্বেও কিভাবে মহিলারা কবর যিয়ারত করে থাকে ?

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যঃ

◈ কবর বাসীদেরকে সালাম জানানো; ফুলের তোড়া দিয়ে তাদের পুজা করা নয়।

◈ কবর বাসীদের জন্যে আল্লাহর নিকট মাগ্‌ফিরাতের দোয়া করা; তাদের নিকট কোন কিছু চাওয়া বা পাওয়ার জন্য নয়।

◈ কবর যিয়ারতের মাধ্যমে মৃত্যুর কথা স্বরণ করা ও দুনিয়াকে অগ্রাধিকার না দিয়ে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা; আনন্দ-ফুর্তি ও দিবস পালনের জন্য নয়।

◈ কবর যিয়ারতের মাধ্যমে মৃত্যু ব্যাক্তির কবরের পরিণতির কথা স্বরণ করা; অতীতে সে কি ছিল বা কি করে গেছে-ঐ সমস্ত বিষয়ে ভাষণ দেওয়ার জন্য নয়।

◈ কবর যিয়ারতের মাধ্যমে নিজের অহংকার ও গৌবরকে ধুলিস্বাৎ করে দেওয়া।

◈ কবর যিয়ারত করতে গিয়ে রাসুল (ﷺ) এর আদর্শের অনুসরণ করা এবং সকল প্রকার বিদ'আত থেকে সতর্ক থাকা।

- **কবর যিয়ারতের দোয়াঃ**

(السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية) (مسلم ٩٧٥)

উচ্চারনঃ আছ্ ছালামু আলাইকুম্ ইয়া আহ্লাদ্ দিয়ারে মিনাল মু'মিনীনা অল-মুস্‌লিমীন, অ-ইন্না- ইন্‌শা-আল্লাহু বিকুম লাহিকুন, নাছ্-আলুল্লাহা লানা অলাকুমুল আফিয়াহ্। (মুসলিম ৯৭৫)

অতএব, আমরা কবরের পার্শ্বে গিয়ে নিজেকে ছোট মনে করে এবং মৃত্যুর কথা স্বরণ করে উপরোক্ত দোয়া পাঠের মাধ্যমে

করব যিয়ারত করব এবং অন্যান্য বিদ'আত থেকে সতর্ক থাকব। যেমন: কবরের পার্শ্বে দাড়িয়ে দরূদ পাঠ, ফাতেহা পাঠ, কোরআন পাঠসহ আরো অনেক ধরণের বিদ'আত- যার প্রচলন আমাদের মধ্যে রয়েছে।

কাজে তাওহীদের প্রভাব

তাওহীদ হচ্ছে- একত্ববাদ অর্থাৎ প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পরিবর্তনকারী ইত্যাদী হিসাবে ও মা'বুদ হিসাবে আল্লাহকে এক বলে মেনে নেওয়া এবং তাঁর সুন্দর সুন্দর নামসমূহ ও গুণাবলীসমূহ কে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা সাদৃশ্য না দিয়ে সরাসরি তাঁর জন্যেই সাব্যস্ত করা। মূলত: এই তাওহীদের জন্যেই আল্লাহ জ্বীন ও ইনসান জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ الذاريات: ٥٦

অর্থঃ আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও ইনসানকে কেবল এজন্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। (সুরা যারিয়াত: ৫৬)

তাওহীদ মানুষের জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে বাস্তবায়ণ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন।

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ﴾ النحل: ٣٦

অর্থঃ আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি; যাতে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে বিরত থাক। (সুরা নাহল :৩৬)

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

قال ﷺ: ((...حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ...)) (متفق عليه)

অর্থঃ বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব হচ্ছে- তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

যে তাওহীদকে তার বাস্তব জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পুরোপুরী ভাবে মেনে নিয়ে সে অনুপাতে আমল করবে, সে নিম্মের ফলগুলো ভোগ করবে-

- বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এবং কোন আযাব ভোগ করবে না।
- তাওহীদ গুণাহ্ মাফের কারণ।
- তাওহীদ জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকা থেকে বিরত রাখে।
- তাওহীদ পন্থী হেদায়েত এবং দুনিয়া ও আখেরাতে পূর্ণ নিরাপত্তা পেয়ে থাকে।
- সমস্ত কথা ও কাজ তাওহীদ অনুযায়ী হয়ে থাকে।
- তাওহীদ বান্দার অপছন্দনীয় কাজসমূহকে কমিয়ে দেয়।
- আল্লাহ তাওহীদপন্থীর সাহায্য-সহযোগিতার জিম্মাদার হন।

কে খাঁটি মুসলমান ?

কে খাঁটি মুসলমান প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোরআন হাদীসের কষ্টি পাথরে যাচাই-বাছাই করলে খাঁটি মুসলমানের সংস্যা খুবই নগন্য হয়ে দাঁড়াবে। কেননা, আমরা যদি আমাদের দেশের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখা যাবে আমাদের দেশে ৯০% এরও বেশী মুসলমান। কিন্তু খাঁটি বা প্রকৃত মুসলমান হাতে গণা কয়েক জন হবে কিনা সন্দেহ আছে।

শুধু মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহন করলেই মুসলমান হওয়া যায় না। প্রকৃত বা খাঁটি মুসলমান হতে হলে ইসলামের হুকুম-আহ্কাম ও বিধি-বিধানগুলোকে পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে। আমরা মুসলমান, নিজেকে নিয়ে গৌরব করি। কিন্তু একবার এটুকু চিন্তা করেছি কি (?) আমার ভিতর ইসলামের কোন্ কথা বা কাজটি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। যে কালিমার সাক্ষ্য দিয়ে মুসলমান হতে হয়, সেই কালিমাই বলতে পারিনা, ঠিকমত নামায আদায় করি না, রামাযান মাসের রোযা রাখি না এবং সামর্থ থাকা সত্বেও যাকাত দেই না বা হজ্ব আদায় করি না। তারপরও আমরা মুসলমান বলে দাবী করে থাকি!

এ দিকে আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾ ال عمران: ١٠٢

অর্থঃ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁকে ভয় করার মত এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সুরা আল-ইমরান: ১০২)

ইসলামকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে তার উপর অটুট থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত বিছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন।
প্রকৃত মুসলমান হতে হলে ইসলামের ভিত্তিগুলোর উপর পরিপূর্ণ ভাবে 'আমল' করতে হবে। বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীছে এসেছে-

عن ابن عمر ﷺ قال قال رسول الله ﷺ ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)) (متفق عليه)

অর্থঃ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন: রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত: (১) সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) রামাযান মাসের রোযা রাখা এবং (৫) বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘরের হজ্ব করা। (বুখারী, মুসলিম)

এই হচ্ছে ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তি। এইগুলি পালনের সাথে সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদেরকে খাঁটি মু'মেন বা মুসলমান হওয়ার জন্যে অন্যান্য যে সমস্ত গুণাবলীর কথা বলেছেন- ঐসমস্ত গুণেও গুণান্বিত হতে হবে। অন্যথায় আমরা শুধু নামধারী মুসলমান হয়ে থাকব, প্রকৃত বা খাঁটি মুসলমান হতে পারবো না।

খাঁটি মুসলমানদের চিত্রঃ

লক্ষ্য করুন বেলাল (রাঃ) দিকে। ঈমান আনার কারণে তাঁকে উত্তপ্ত মরূভুমিতে ফেলে, বুকের উপর পাথর চেপেঁ দিয়েছিল, তবুও তিনি ইসলাম ত্যাগ করেননি। স্বয়ং রাসুল (সাঃ) কা'বার পার্শ্বে নামায পড়া অবস্থায় তাঁর উপর উটের নাড়ী-ভুড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল, তবুও তিনি নামায ছাড়েননি। হায়! এরকম পরিস্থিতি আমাদের হলে আমরা কি করতাম ?

আল্লাহ আমাদের সবাইকে খাঁটি মুসলমান হয়ে দুনিয়াতে বসবাস করার তাওফীক দান করুন!

কতিপয় এবাদত

এবাদত হচ্ছে- প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য এমন কিছু কথা ও কর্মের নাম, যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন ও ভালবাসেন।

অতএব আমাদের যে কোন কথা ও কাজ তখনই এবাদত হিসাবে গণ্য হবে, যখন আমাদের কাজ ও কথাগুলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আদেশ ও নিষেধ অনুসারে অর্থাৎ কোরআন ও হাদীছ মোতাবেক হবে। এর ভিত্তিতে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, চলা-ফিরা, আচার-ব্যবহার, কাজ-কর্ম, কথা-বার্তাসহ জীবনের যাবতীয় বিষয় এবাদতে শামিল হতে পারে, যদি তা উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে আদায় করা হয়।

যেমন- ঘুম, যা মানুষ নিজের আরাম ও স্বস্থির জন্যই পেড়ে থাকে। তবু এই ঘুম তখনই এবাদত হিসেবে গণ্য হবে, যখন এ'শার নামায আদায় করে আবার ফজরের নামাযের মনোভাব রেখে বিছানায় গিয়ে ডান কাতে শুয়ে যিকির-আয্কার ও দোয়া-দরূদ সহ অন্যান্য ছোট-খাট সুরাসমূহ যা রাসুল পাঠ করতেন তা পাঠ করে ঘুমিয়ে পড়ে। তা না করে যদি তার বিপরিত কাজ করে, যেমন- এ'শার নামায পড়ল না, ফজর পড়ারও কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। তারপর বিছানায় গিয়ে দোয়া-দরূদ, যিকির-আয্কার ও সুরা-ক্বেরাত দূরের কথা; অশ্লিল ও অশালিন বিভিন্ন ছবি বা চ্যানেল দেখতে দেখতে শর্টপ্যান্ট বা আর্ধলেংটা অবস্থায় বেঙের মত উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তাহলে এই ধরনের ঘুমের মাধ্যমে কিছুতেই এবাদতের আশা করা যায়না। ঠিক অন্যান্য বিষয়গুলোতেও তাই, কোরআন ও রাসুলের সুন্নাত মুতাবেক করলে এবাদত হিসাবে গণ্য হবে; অন্যথায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুণাহের ভাগি হতে হবে।

নিম্মে গুরুত্বপূর্ণ কিছু এবাদতের প্রকার উল্লেখ করা হলঃ

◈ নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব-উমরাহ, ছদ্কা, দান-খয়রাত, যিকির-আয্কার, কোরআন তেলাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানসহ আরো অনেক এবাদত রয়েছে। যার প্রতি মানুষ গুরুত্ব না দিয়ে ঐসমস্ত কাজগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যেও করে থাকে, ফলে তারা শির্কের মত মহাপাপে জড়িয়ে পড়ে।

তম্মধ্যে:

◈ দোয়া চাওয়া: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট কোন কিছু চাওয়া যাবেনা।

◈ ভয়-ভীতি: ভয় একমাত্র আল্লাহকেই করতে হবে।

◈ আশা-আকাঙ্ক্ষা: আশা-আকাঙ্ক্ষা একমাত্র আল্লাহর নিকটই করতে হবে।

◈ ভরসা: ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই রাখতে হবে।

◈ পশু-পাখি জবাই বা কোরবানী একমাত্র আল্লাহর নামেই করতে হবে।

◈ নয্‌র-নিয়ায একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হবে।

◈ রুকু, সিজ্‌দাহ্‌, তাওয়াফ ইত্যাদী একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করতে হবে; আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে করা যাবেনা।

◈ কস্‌ম খাওয়া বা শপথ করা: কস্‌ম বা শপথ একমাত্র আল্লাহর নামে করতে হবে।

◈ সাহায্য বা সহায়তা চাওয়া: সাহায্য বা সহায়তা একমাত্র আল্লাহর নিকট চাইতে হবে।

এইগুলো ছাড়াও আরো অনেক প্রকারের এবাদত রয়েছে যা করা শরীয়ত সম্মত। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় এবাদত বুঝে-শুনে তাঁরই উদ্দেশ্যে করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

অজু ও তায়াম্মুম

অজুর পদ্ধতি:

◈ যখন কোন মুসলমান অজু করার ইচ্ছা করবে তখন অন্তরে নিয়্যাত করবে। তারপর "বিছমিল্লাহ" বলবে।

◈ তারপর তিনবার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে।

◈ তারপর কুলি করবে। অর্থাৎ মুখে পানি দিয়ে নাড়াচাড়া করে ফেলে দিবে।

◈ তারপর নাক পরিস্কার করবে। অর্থাৎ নাকের ভিতর পানি টেনে নিয়ে তা ঝেড়ে ফেলে দিবে।

◈ তারপর চেহারা ধৌত করবে তিন বার। চেহারার সীমা হচ্ছে- দৈর্ঘে চুল উঠার স্থান থেকে থুতনীর নীচ পর্যন্ত এবং প্রস্থে এক কানের গোড়া থেকে অপর কানের গোড়া পর্যন্ত।

যার চেহারায় দাড়ি আছে- তা যদি পাতলা হয়, তাহলে তা ধৌত করা ও তার নীচে যে চামড়া থাকবে, তাও ধৌত করা ওয়াজিব। আর খুব ঘন হলে বাহ্যিক সাইট ধৌত করা ওয়াজিব। কিন্তু ঘন দাড়ি খেলাল করা মুস্তাহাব কেননা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) "অজুতে তাঁর দাড়ি খেলাল করতেন"। (আবু দাউদ)

◈ তারপর কনুইসহ দুই হাত ধৌত করবে তিন বার।

◈ তারপর দুই কান সহ একবার মাথা মাছাহ করবে। মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে হাতদ্বয় মাথার শেষ ভাগে নিয়ে যাবে, আবার অগ্রভাগে নিয়ে আসবে। তারপর দুই কান মাছাহ্ করবে। কান মাছেহ্ এর জন্য নতুন পানির প্রয়োজন নেই।

◈ তারপর টাকনুসহ দুই পা ধৌত করবে তিন বার। টাকনু হচ্ছে- পিন্ডলীর নিন্মের উঁচু হাড়দ্বয়। ঐদুটিকে পায়ের সাথে ধৌত করা ওয়াজিব।

◈ তারপর অজু শেষ করে এই দোয়া পড়বেঃ- আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু, ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্‌দুহু ওয়া রাসুলুহ্, আল্লাহুম্মাজ্‌য়ালনী মিনাত্তাওয়াবীনা ওয়াজ্‌য়াল্‌নী মিনাল মুতাতাহ্যিরীন। (মুসলিম, তিরমিযী)

অর্থঃ-আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া (হক্ব) কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। হে আল্লাহ আমাকে তওবাকারী ও পবিত্র বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

সতর্কঃ

◈ যত্ন সহকারে অজু করতে হবে, যাতে করে অজুর কোন স্থানে চুল পরিমান জায়গা শুকনা না থাকে। কোন স্থানে পানি না পৌঁছলে অজু হবে না। আর অজু না হলে নামায হবে না।

◈ পবিত্রতা অর্জন ছাড়া নামায পড়া কবীরা গুণাহের অন্তর্ভূক্ত।

তায়াম্মুম এর পদ্ধতিঃ

পানি পাওয়া না গেলে বা পানি আছে কিন্তু ব্যবহার করলে শারীরিক কোন ক্ষতি হতে পারে, এমতাবস্থায় অজু বা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায়েয আছে।

তায়াম্মুম এর পদ্ধতি: প্রথমে অন্তরে নিয়্যাত করবে তারপর "বিছমিল্লাহ" বলে একবার দুই হাত মাটিতে মারবে। তারপর চেহারা মাছাহ করবে ও ডান হাত দিয়ে, বাম হাতের কব্জি ও বাম হাত দিয়ে, ডান হাতের কব্জির উপরি ভাগ মাছাহ কবরে। এতেই অজু বা গোসলের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

নামাযের গুরুত্ব ও ফজীলত

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল নামাযের গুরুত্ব ও ফজীলত সম্পর্কে কোরআন-হাদীসে অনেক কথা উল্লেখ করেছেন, যা আলোচনা করা আমাদের এই ছোট্ট পরিসরে সম্ভব হবেনা। তাই এর মধ্য থেকে সামান্য কয়েকটি পয়েন্ট তুলে ধরলাম, যাতে করে এগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে সত্যিকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায অন্যান্য মুসলমানদের সাথে মসজিদে গিয়ে জামা'তের সাথে আদায় করতে পারি!

তাহচ্ছে-

- ◈ নামায ইসলামের ভিত্তিসমূহের দ্বিতীয় ভিত্তি।
- ◈ নামায সম্পর্কে কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে।
- ◈ নামায মু'মেন-মুত্তাক্বীন বান্দাদের বিশেষ 'আলমত'।

◈ যে নামাযের সংরক্ষণ করে, সে তার দ্বীনের সংরক্ষন করল।

◈ নামায বান্দাহ তার প্রভুকে ভালবাসা ও মূল্যায়ণের পরিচয়।

◈ কোরআন-হাদীস নামায পরিত্যাগকারীকে সুস্পষ্টভাবে কাফের আখ্যায়িত করেছে।

◈ নামাযে যত্নবান হওয়া অন্যান্য 'আমল' কবুল হওয়ার কারণ।

◈ নামাযে যত্নবান হওয়া মুনাফেকী 'আলামত থেকে মুক্ত থাকা।

◈ নামাযে যত্নবান হওয়া ফেরাউন, কারূণ, হামান ও উবাই বিন খাল্‌ফ এর সাথে হাশ্‌র-নশ্‌র হওয়া থেকে মুক্ত থাকার উপায়।

◈ নামায নামাযীর চোখ জোড়ায়, অন্তরকে আলোকিত করে এবং চেহারাকে উজ্জ্বল করে।

◈ নামাযে নামাযীর অন্তরে আনন্দ যোগায় এবং অন্তরকে শক্তিশালী ও প্রশস্ত করে।

◈ নামায নামাযীকে গর্হিত, মন্দ ও ফাহেশা কাজ থেকে বিরত রাখে।

◈ নামায রিযিক আনয়ণকারী, জুলুম-অত্যাচার দূরকারী ও নে'য়ামতের সংরক্ষণকারী।

◈ নামায আযাব-গযব, দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-ভাবনা ও মানষিক যাবতীয় রোগ নিরাময়কারী।

◈ নামায পরস্পর উত্তম ও সওয়াবের কাজে সহযোগিতা করে এবং হক্ব ও ধর্যের উপদেশ দেয়।

নামাযে চিকিৎসা সংক্রান্ত উপকারিতাঃ

◈ নামাযে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, রুকু, সিজদাহ্ এবং রুকু সিজদাহ্ থেকে উঠা ইত্যাদী আমলগুলোতে বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ব্যায়াম হয়। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মজবুত ও শক্তিশালী করে, যা শরীরের জন্যে খুবই উপকারী। নামায পড়াতে অনেক ধরনের পেটের ব্যাথাও নিরাময় হয়।

মানুষের পরিস্থিতিঃ

নামাযের এতসব গুরুত্ব থাকা সত্বেও যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন আমাদের মধ্যে কারো কাপড় খারাপ, কারো শরীর খারাপ, কারো শরীর ভাল নয়, কারো মন-মিজাঝ ভাল নয়, কারো এইকাম সেইকাম, আবার কেউ কেউ পরবর্তীতে পড়ে নিব। এই সমস্ত কথা বলে নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ্ তাদের হেদায়েত দান করুন!

নামাযের অপরিসিম গুরুত্ব রয়েছে বিধায় আল্লাহ নামাযকে সর্বাবস্থায় আদায় করতে নির্দেশ করেছেন। সফরে, বাড়িতে, যুদ্ধে, শান্তিতে, সুস্থতায় ও অসুস্থতায়। নামায দাঁড়িয়ে পড়তে হবে, তা সম্ভব না হলে- বসে বসে আদায় করতে হবে, তাও সম্ভব না হলে- শুয়ে শুয়ে আদায় করতে হবে, তাও সম্ভব না হলে- ইশারায় নামায আদায় করতে হবে, তবু নামায বাদ দেওয়া যাবে না। আল্লাহ্ তুমি প্রতিটি মুসলমানকে নামাযী বানিয়ে দাও !

নামায ত্যাগকারীর বিধান

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সলেহ আল-উছাইমীন বলেন: নামায ত্যাগকারীর বিধান হচ্ছে যে, সে এমন কাফের যা দ্বীন থেকে বহিস্কার করে দেয়। এবং তার উপর দুনিয়াবী কিছু বিধান ও পরকালের কিছু বিধান বর্তাবে। যেমন-

প্রথমতঃ- ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মুরতাদদের অন্তর্ভূক্ত হবে। অতঃপর তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হবে তাতে যদি ফিরে আসে (আলহামদুলিল্লাহ) অন্যথায় তাকে কতল করা ওয়াজিব। কেননা নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন-

قال ﷺ: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)) (رواه البخاري ٢٨٥٤)

অর্থ:- "যে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে দিল তোমরা তাকে কতল (হত্যা) কর"। (বুখারী ২৮৫৪)

দ্বিতীয়তঃ- তার পক্ষে কোন মুসলিম নারীকে বিবাহ করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ الممتحنة: ١٠

অর্থ:- "হে মুমিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিনা নারীরা দেশত্যাগী হয়ে আসলে তোমরা তাদের কে পরীক্ষা করো, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিনা তবে তাদের কে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিওনা।

মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্যে বৈধ নয় এবং কাফিররা মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়"। (সুরা মুমতাহিনাহ্ :১০)

তৃতীয়তঃ- নামায পড়া অবস্থায় বিয়ে করেছিল এবং পরে নামায পরিত্যাগ করল এতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এবং ঐ স্ত্রী তার উপর হারাম হয়ে যাবে ও সে তার কাছে একজন অপরিচিত লোক হিসাবে গণ্য হবে যতক্ষন পর্যন্ত ইসলামে ফিরে এসে নামায আদায় না করবে। ফুকাহাগণ একে কাফেরদের বিবাহের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বা তাদের একজন (মুরতাদ) ইসলাম থেকে বহিস্কার হয়ে গিয়েছে। কেননা স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন মুরতাদ হয়ে গেলে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় আর এতে তালাকের কোন প্রয়োজন হয় না। এবং সে তওবা করলে ও নামায পড়লে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু বেনামাযীর বিবাহ বন্ধন নামায না পড়ার কারণে সহীহ হয়না বিধায় যখন সে নামায পড়বে তখন তাকে আবার বিবাহে আবদ্ধ হতে হবে।

চতুর্থতঃ- বেনামাযী মারা গেলে তাকে গোসল দেওয়া হবেনা, কাফন দেওয়া হবেনা, তার উপর জানাযা নামায পড়া হবেনা এবং কেউ তার জন্যে রহমতের দোয়া করতে পারবে না। এবং তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবেনা বরং দূরবর্তী কোন স্থানে গর্ত করে সেখানে মাটি দিয়ে রাখতে হবে, যাতে তার দুর্গন্ধ মানুষদের কে কষ্ট না দেয় এবং তার সম্মান না থাকায় যাতে তার দর্শন তার পরিবার পরিজনকে কষ্ট না দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:-

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾ التوبة: ٨٤

অর্থ:- "আর তাদের মধ্য হতে কেউ মরে গেলে তার উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বে না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবেনা; তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা ফাসেকী অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে"। (সুরা তওবা: ৮৪)

পঞ্চমতঃ- তার জবাইকৃত বস্তু হালাল নয়। অর্থাৎ বেনামাযী জবাই করলে তার জবাইকৃত বস্তুর গোশত খাওয়া আমাদের জন্যে হারাম। তবে কোন ইয়াহুদী বা নাসরানীর জবাইকৃত বস্তু খাওয়া আমাদের জন্যে হালাল। তার কারণ জবাইকারী জবাইয়ের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জবাইকৃত বস্তু হালাল নয়।

জবাইয়ের উপযুক্ত হয় তিন প্রকার লোক:- (ক) মুসলমান। (খ) ইয়াহুদী। (গ) নাসারা। এই তিন প্রকার লোকের জবাইকৃত বস্তু হালাল। এবং তারা ব্যতীত অন্য যে সমস্ত মুশরিক, নাস্তিক ও ধর্মত্যাগী তাদের জবাইকৃত বস্তু হালাল নয়।

ছষ্ঠতঃ- বেনামাযী মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি মারা গেল এবং রেখে গেল এক ছেলে- বেনামাযী, ও চাচতো ভাই নামাযী। এমতাবস্থায় যিনি ওয়ারিশ হবেন তিনি হলেন- চাচাতো ভাই এবং ছেলে ওয়ারিশ হবে না। অণূরূপ ভাবে ছেলে মৃত্যুবরণ করলো রেখে গেল পিতা ও চাচা, পিতা নামায পড়েনা ও চাচা নামায পড়ে তখন পিতা ব্যতীত চাচাই ওয়ারিশ হবেন। এর স্বপক্ষে দলীল হচ্ছে নাবী (ﷺ) এর কথা- যা উছামা বিন যাইদ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন- যে,

قال ﷺ: ((لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)) (متفق عليه)

অর্থ:- "কোন মুসলমান কাফেরের এবং কোন কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হবে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

সপ্তমতঃ- সে তার মেয়েদের অভিবাবক (অলি) হতে পারবেনা এবং তাদের কে বিয়ে দেওয়ার মালিকও হতে পারবেনা। যেমন কোন বেনামাযী ব্যক্তির কতগুলো মেয়ে রয়েছে এবং কেউ তাদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে তখন সেই ব্যক্তি তাদেরকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করাতে পারবেনা। কেননা মুসলমানের উপর কোন কাফেরের অভিভাবকত্ব নেই। বরং তাদের বিবাহের কাজ সম্পন্ন করবে অন্য অতি নিকটবর্তী অভিবাবকগন।

অষ্টমতঃ- বেনামাযী তার সন্তানদের উপর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে না। কেননা কোন বেনামাযীর সন্তান থাকাবস্থায় নামায না পড়ার কারণে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, এবং ঐ সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে তাদের মা। কারণ মুসলমানের উপর কোন কাফেরের রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব নেই।

যা উল্লেখ করা হল তা ছাড়াও বেনামাযীর আরো অনেক পরিনাম রয়েছে, যেমন- তাকে পরিত্যাগ করা, ছালাম না দেওয়া কেননা সে কাফের। কা'য়াব বিন মালিক এবং তার দুই সঙ্গী তাবুকের যুদ্ধে পশ্চাৎপদতা করার কারনে নাবী কারীম (ﷺ) তাদের কে পরিত্যাগ করেছিলেন। এমন কাজ করার জন্য যা কুফরীর দরজা পর্যন্ত পৌছে না। পক্ষান্তরে যে কাজ কুফরী পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয় তার ব্যপারে কেমন হওয়া দরকার ?

দ্বিতীয়তঃ- আখেরাতী বিধান।

কেয়ামতের দিন তার হাশর-নাশর হবে ফেরাউন, হামান, কারূন এবং উবাই বিন খালাফের সঙ্গে। যেমন এক হাদীসে নাবী (ﷺ) থেকে এসেছে- যখন তাকে সেই সমস্ত কাফেরদের নেতাদের সাথে

হাশর করানো হবে তখন তার স্থান হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। পরিশেষে আল্লাহর কাছে নামায পরিত্যাগ করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

আসুন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করে দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল অর্জন করার চেষ্টা করি! হে আল্লাহ ! আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন !

রামাযান ও রোযার ফজীলত

রোযা ও রমযানের ফজীলত কম নয় যা আমরা ওয়াজ-নছিহত, বই-পুস্তক, টিবি-রেডিও, ক্যাসেট ইত্যাদীতে শুনে থাকি। জানা আছে ঠিক, তবে আমল নেই, এই হচ্ছে আমাদের ত্রুটি। নিম্নে রোযা ও রমযানের সামান্য কিছু ফজীলত সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল।

রামাযান মাসের ফজীলত:

◈ রামাযান মাসের রোযা রাখা ইসলামের একটি রুকন (স্তম্ভ)।

◈ রামাযান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

◈ রামাযান মাসে শয়তানগুলোকে শিকলাবদ্ধ করা হয়।

◈ রামাযান মাস- রহমত, মাগ্‌ফেরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস।

◈ রামাযান মাসে যে কোন এবাদতের সওয়াব সত্তর গুণে বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।

◈ রামাযান মাসে একটি উমরাহ্ রাসুলের সাথে হজ্ব করার সমান সওয়াব।

◈ রামাযান মাসেই 'লাইলাতুল ক্বদর' যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

◈ রামাযান মাস- তারাবীহ (কিয়ামুল লাইল) এর মত গুরুত্বপূর্ণ এবাদতের সুযোগ করে দেয়।

◈ রামাযান মাস- সমস্ত গুণা মাফ করে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ এনে দেয়।

◈ রামাযান মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে আল্লাহ কিছু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে থাকেন।

রোযার ফজীলত সমূহঃ

◈ রোযার সওয়াব আল্লাহ তাঁর নিজ হাতে প্রদান করবেন।

◈ রোযাদারের জন্যে দুইটি আনন্দের মূহুর্ত রয়েছে, একটি ইফতারের সময় অন্যটি জান্নাতে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়।

◈ রোযা মিথ্যা বলা ও সেই অনুপাতে কাজ পরিহার করার শিক্ষাদেয়।

◈ রোযা ঢাল স্বরূপ। যে কোন মন্দ কাজে বাধা প্রদান করে।

◈ রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশ্‌কে আম্বরের চেয়েও বেশী সুঘ্রান।

◈ ইফতারের পূর্ব মূহুর্তে রোযাদারের দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।

◈ রোযা মানুষের আত্মাকে অবাধ্যতা ও অসতর্কতা থেকে ফিরিয়ে রাখে।

◈ রোযা মানুষের ক্বল্‌বকে (দিল কে) যিকির-আয্‌কারের সুযোগ করে দেয়।

◈ শয়তান মানুষের রগে রগে চলে বিধায়, রোযা মানুষের রগগুলোকে সংকির্ণ করে দেয়, ফলে শয়তান ঢুকতে না পারে।

◈ ধনী ব্যাক্তিরা রোযার মাধ্যমে গরীবদের অনাহারসহ অন্যান্য সমস্যার কথা অনুভব করতে পারে।

◈ রোযা মানুষের গুণাসমূহ মিটিয়ে দেয়।

◈ জান্নাতের 'রাইয়্যান' দরজা দিয়ে রোযাদার ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করবে না।

এতসব ফজীলত ও গুরুত্ব থাকা সত্যেও বে-রোযাদাররা; রমযান মাস আসলেই রোযা না রাখার জন্যে, নিজে নিজে হরেক রকম রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভান করে রোযা রাখা থেকে বিরত থাকে। আর মনে করে আল্লাহকে ফাঁকি দিয়েছে। না; আল্লাহকে ফাঁকি দেয় নাই বরং নিজেদেরকেই ফাঁকি দিয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত দান করুন !

হজ্ব ও উমরার ফজীলত

হজ্ব ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি বা রোকন। যার বাইতুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত পৌছার শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ আছে তার উপর হজ্ব আদায় করা ফরজ । হজ্ব ফরজ হওয়ার পর কেউ হজ্ব না করে মৃত্যুবরণ করলে তাকে কাল কিয়ামতের দিন হজ্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। অনূরূপ ভাবে কারো উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার পর হজ্ব না করে মৃত্যুবরণ করলে তার পক্ষ্য থেকে বদ্‌লী হজ্ব করাতে হবে। তবে যিনি বদলী হজ্ব করবেন, পূর্বে তার নিজের হজ্ব করা থাকতে হবে। চাই তিনি মৃত ব্যাক্তির ছেলে হোন বা অন্য কেউ হোন। নিজের হজ্ব করা না থাকলে বদলী হজ্ব করা যায় না। কেননা হাদীসে এসেছে রাসুলের যামানায় এক লোক অন্য লোকের বদলী হজ্ব করতে গিয়ে, মীকাত থেকে হজ্বের নিয়্যাত করার সময় বলল: 'লাব্বাইক আন্ শুবরুমা' অর্থাৎ শুবরুমার পক্ষ্য থেকে হজ্বের নিয়্যাত করলাম। 'শুবরুমা' একজন লোকের নাম। তখন রাসুল জিজ্ঞাসা করলেন শুবরুমা কে ? উত্তরে বলল: আমার নিকটাত্নীয়; তখন রাসুল বললেন: প্রথমে তোমার নিজের হজ্ব কর, পরে তার পক্ষ্য থেকে করবে। কেননা, ঐ লোকের পূর্বে নিজের হজ্ব করা ছিলনা।

হজ্বের অপরিসিম গুরুত্ব ও ফজীলত রয়েছে। তার মধ্যে নিম্নে কয়েকটি প্রদত্ত হল যেমন:

◈ হজ্বে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ণ ও তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়া হয়। আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ البقرة: ١٩٦

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব ও উমরাহ সম্পন্ন কর। (সুরা বাক্বারা: ১৯৬)

◈ হজ্ব পূর্বের যাবতীয় গুণাহ্ ও অপরাধসমূহকে বিমূলে নষ্ট করে দেয়।

◈ হজ্বকারী হজ্ব থেকে এমন ভাবে নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে, যেমন

সন্তান ভুমিষ্টের পরে নিষ্পাপ থাকে।

◈ হজ্ব জিহাদের প্রকারসমূহের অন্যতম একটি।

◈ হজ্বের প্রতিদান জান্নাত। কোন হজ্বকারীর হজ্ব আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেলে তার প্রতিদান হিসাবে জান্নাত পেয়ে যায়। তাহলে আর কি বাকি থাকে ?

◈ উমরার ফজীলতও কম নয়। রাসুল (ﷺ) এক হাদীছে বলেছেন: এক উমরাহ থেকে অন্য উমরাহ কাফ্ফারা স্বরূপ। অর্থাৎ একবার উমরাহ করার পর আবার উমরাহ করলে, দুই উমরার মধ্যবর্তী সমস্ত সগীরা গুণাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।

সতর্কঃ

বাংলাদেশী অনেক লোক সৌদী আরবে রয়েছেন, যাদের উপর হজ্ব ফরজ হয়ে গিয়েছে। তা সত্বেও অর্থ-সম্পদের লোভে পড়ে হজ্ব করছেন না। বরং কিভাবে আরো অর্থ-সম্পদ বাড়ানো যায় সেই চিন্তায় ব্যস্ত। ঐসমস্ত লোকদের জানা দরকার যে, তাদের এই সম্পত্তি মৃত্যুর পর তাদের সাথে কবরে যাবে না। পরিশেষে সকল ভাইদের নিকট আবেদন- যাদের হজ্ব করার সামর্থ রয়েছে , তাঁরা দ্রুত হজ্ব পালন করার চেষ্টা করুন !

যাদু-টুনা

যাদুর হাকীকতঃ

যাদু এমন এক বিদ্যা, যা কুফুরী কালাম (অর্থাৎ এমন সব মন্ত্র যা বললে মানুষ দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়) ও জ্বীন-ভূতের আশ্রয় ছাড়া হয় না।

বাস্তব ঘটনাঃ

আমার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় ছিল, তার ব্যবসা ছিল যাদু-টোনা, বানমারা, কুফরী কালাম করা ইত্যাদী। সে আবরী পড়া যানতো না, যার কারণে ঐসমস্ত কাজ-কর্মে হরেক রকম ছক একেঁ বিভিন্ন আবরী অক্ষর বা সংখ্যা লিখতে হতো, ফলে সে আমার সাহায্য নিতো। তখন আমি মাদ্রাসায় পড়ি। আমার হাদীয়া হিসাবে (লেমুনচুচ) চকলেট, বিস্কুট ইত্যাদী আনতো। ঘটনাক্রমে একদিন কিছুই আনে নাই। আমি তার হাতের দিকে তাকিয়ে আছি। পরে আমাকে বলল: অসুবিধা নেই তুমি কাজ করে দাও হাদীয়া আছে। তার কথা মত কাজ সমাধা করলাম। পরে আমাকে বলল তোমার হাতটা দাও, হাতটা এগিয়ে দিলাম, মূহুর্তের মধ্যেই কি যেন মন্ত্র পড়ে আমার আঙ্গুলে ফুঁ দিল এবং বলল লেমুনচুচ খাও। আমি আঙ্গুল মুখে দিয়ে চুসতেই মিষ্টি লাগতে শুরু করল: এতে আশ্চার্য হয়ে গেলাম। একই পরিস্থিতি ঘটল অন্য আরেক দিন। কিছুই আনল না বরং কাজ শেষে বলল একটি মাটির টুকরো (ঢিল) নিয়ে এসো। আমার পর মনে মনে কি যেন মন্ত্র পড়ে সেই মাটির টুকরোতে ফুঁ দিয়ে আমাকে বলল:

নাও (গাট্টা) তালমিছরী খাও। তার কথা মত মাটির টুকরা মুখে দিয়ে দেখি; সত্যিকার তালমিছরীর মতই মিষ্টি লাগছে।

যাইহোক পরে আমার মাথায় ফন্দি আঁটল আমি যদি আঙ্গুলকে চকলেট বানানো ও মাটির টুকরাকে তালমিছরী বানানো শিখতে পারি; তাহেলে ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে চমক সৃষ্টি করে দিতে পারব। যার কারণে একদিন ঐলোকের সাথে চুক্তি করলাম আমাকে এক দু'টা যাদু না শিখাইলে তাকে আর কোন সহযোগিতা করব না। সে তাতেই রাজি হল, কিন্তু শিখাব শিখাব করে বেশ কিছু দিন পার করে দিল।

এরপর যখন আসল তখন তাকে শক্ত করে ধরে তার সাথে চুক্তি করে নিলাম, আজকে অবশ্যই শিখাইতে হবে। কাজ শেষ করার পর বলল: ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও! জিজ্ঞাস করলাম: দরজা বন্ধ করব কেন ? বলল: দরকার আছে। কথা মত দরজা বন্ধ করে দিলাম। তখন সে বলতে লাগল: যারা এই সমস্ত জিনিস শিখে তারা মুসলমান থাকে না, দ্বীন-ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় এবং শারীরিক অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। বললাম: কেন ? উত্তরে বলল: এগুলো শিখতে হলে, প্রথমেই তোমাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস নিয়ে বলতে হবে, "আমি আল্লাহর বান্দা নই এবং রাসুলের উম্মত নই" (নাউযুবিল্লাহ)।

এই কথা বলার পর আমাদের দেশের রাস্তা-ঘাটে অন্যান্য যাদুকরদের মত একটা যাদুমন্ত্র পড়ে, আমার সামনে থুথু ফেলল, আর দেখলাম ঐ থুথুগুলো সবই রক্ত। এই দেখে আমার ভিতর ভয় ঢুকে পড়ল এবং তাকে বললাম: আমার এসব শিখতে হবেনা এবং আপনাকে কোন সহযোগিতা করতে পারব না। তারপর থেকে আমার রাস্তা আমি দেখেছি, তার পথ সে দেখেছে।

এবার পাঠকবৃন্দের নিকট প্রশ্ন- বলুন দেখি যাদু বিদ্যার মূল কি ? এবং যাদু মানুষকে কোথায় পৌছে দেয় ? আমার মনে হয় আপনাদের বুঝতে আর বাকী নেই; বরং কোরআন-হাদীস আমাদেরকে যাদু শিখা বা যাদুর আশ্রয় নেওয়া থেকে নিষেধ করেছে। আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ البقرة: ١٠٢

অর্থঃ এবং সুলাইমান (আঃ) কুফরি করেননি কিন্তু শয়তানরাই কুফরি করেছিল তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিতো। (সুরা আল-বাক্বারাহ: ১০২)

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر ...)) (رواه البخاري ٥٤٣١)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্তক বস্তু থেকে বিরত হও (ক) আল্লাহর সাথে শিরক করা (খ) যাদু ...। (বুখারী ৫৪৩১)

যাদুর অপকারিতাঃ-

- ◈ যাদু মানুষকে ধ্বংশ করে দেয়।
- ◈ যাদুকর কোন অবস্থাতেই কামিয়াব হয় না।
- ◈ যাদুকরের বিধান হচ্ছে হত্যা।
- ◈ যাদুকরের অধিকাংশ কথাই মিথ্যা।

◈ যাদু স্বামী-স্ত্রী তথা দুই মু'মেনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

সুদ খাওয়া

সুদ ও ঘুষ এমন দুইটি জিনিস, যা মানুষের জীবনে সুক্ষ্ম ভাবে জড়িয়ে আছে। মানুষ এদু'টি কাজ ইচ্ছা, অনিচ্ছায় নির্দিধায় করে থাকে। কিন্তু তার পরিণতি সম্পর্কে একটু চিন্তা-ভাবনাও করেনা।

মূল অর্থ ব্যতীত নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত যা দেওয়া বা নেওয়া হয় তাই সুদ। চাই তা ব্যংকিং খাতে হউক অথবা পরস্পর ঋণ বা কর্জে হউক। যেমন- আমাদের সমাজে যারা সুদী কারবারে জড়িত তাদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত রয়েছে, কেউ তাদের নিকট থেকে টাকা নিলে, মাসিক ১০০ তে ১০ টাকা বা হাজারে একশত টাকা হারে সুদ দিতে হয়। নির্ধারিত এই হারে লাভ না দিলে তারা কাউকে টাকা দিবেনা।

অনূরূপ ভাবে ব্যংকিং খাতে- যে সমস্ত ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে অথবা ঋণ নিলে মাসিক বা বাৎসরিক ভাবে নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত লাভ দিতে হয় বা পাওয়া যায়। কিন্তু তা যদি নির্ধারিত হারে না হয়ে, লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে হয় তাহলে তা সুদ বলে গণ্য হবেনা। যেমন- কেউ কাউকে টাকা দিল এই শর্তে যে, এই টাকা দিয়ে যা আয় বা ইন্‌কাম হবে, তার এত অংশ বা এত ভাগ তাকে দিতে হবে।

পক্ষান্তরে যদি ক্ষতি বা লোকসান হয়, তাহলে তার ভাগও তাকে নিতে হবে। তাহলে জায়েয আছে এবং তা সুদ হিসাবে গণ্য হবে না।

সুদ হারাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴾ البقرة: ٢٧٥

অর্থঃ আর আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সুরা বাক্বারা: ২৭৫)

।

সুদের অপকারিতাঃ

◈ আল্লাহ সুদখোরদের সাথে যুদ্ধ করা ঘোষনা দিয়েছেন।

◈ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষীদাতা সকলেই পাপে সমান ভাগী।

◈ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষীদাতা সকলের উপর আল্লাহর লা'নত।

◈ সুদের নিম্নস্তরের গোণাহ্ নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করার গুণাহ্ সমতুল্য।

◈ জেনে শুনে সুদের একটি দেরহাম খাওয়া, ৩৬ বার ব্যভিচার করা থেকেও বড় অপরাধ।

◈ সুদে মাল বর্ধিত হলেও প্রকৃত পক্ষ্যে তাতে কোন বরকত ও আয় নেই।

সুদখোরের সাস্তিঃ

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন মে'রাজে গমন করেছেন তখন তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের কিছু চিত্র দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে

দেখলেন- বড় বড় পেট বিশিষ্ট একদল লোক, যারা পেট বড় হওয়ার কারণে নড়াচড়া করতে পারছে না। তাদের এই অবস্থা দেখে রাসুল জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের এই পরিস্থিতি কেন ? জিব্রাইল উত্তর দিলেন: এরা দুনিয়াতে সুদখোর ছিল।

ঘুষ নেওয়া বা দেওয়া

ঘুষ হচ্ছে- সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্যে বা বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বা অযোগ্যকে পদ পাওয়ার জন্যে বা বিচার কার্যে দূষি ব্যক্তি নির্দোষ ও জয়লাভ করার জন্যে যা প্রদান করা হয় তাকে ঘুষ বলে। ঘুষের আরো অনেক প্রকার রয়েছে, যা এরই মানদন্ডে খুজে বের করতে হবে। এই ঘুষ দেওয়া বা নেওয়ার মাধ্যমে প্রকৃত অধিকারীর প্রতি যুলুম করা হয় এবং ফিৎনা-ফাসাদ সম্প্রসারিত হয়। ঘুষ নেওয়া থেকে আল্লাহ স্পষ্ট ভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ ﴾ البقرة: ١٨٨

অর্থঃ আর তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধনসম্পত্তি অন্যায় রূপে গ্রাস করো না এবং তা বিচারকের নিকট এজন্যে উপস্থাপিত করো না,

যাতে তোমরা জ্ঞাতসারে লোকের ধনের অংশ অন্যায় ভাবে গ্রাস করতে পারো। (সুরা বাক্বারাহঃ ১৮৮)

।

ঘুষের অপকারিতাঃ

- ◈ আল্লাহ ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।
- ◈ ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া উভয়ের উপর আল্লাহর লা'নত।
- ◈ ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া উভয়ই সমান অপরাধি।
- ◈ ঘুষের কারণে গরীব শ্রেনীর লোকদের বেশী ক্ষতি সাধিত হয়।
- ◈ ঘুষের মাধ্যমে একপক্ষের প্রতি জুলুম করা হয়।

যে সমাজে বা দেশে ঘুষের রেওয়াজ চালু নেই, ঐসমস্ত সমাজের লোকেরা তাদের অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে আরামের সাথে জীবন যাপন করছে। বর্তমানে আমাদের সমাজে সুদ ও ঘুষ কে হালাল করার জন্যে বিভিন্ন নামে নাম ধারণ করে তা দেওয়া ও নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন- ইন্টারেষ্ট, লাভ, ফয়দা, বেতনের একাংশ ইত্যাদী। সুদ ও ঘুষ মারাত্নক দু'টি জিনিস যা মানুষকে ধ্বংশের দিকে ঠেলে দেয়। বিধায় সকল পাঠকের নিকট আকুল আবেদন সুদ ও ঘুষ নেওয়া, দেওয়া, সাক্ষী বা লেখক হওয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবেন।

মিথ্যা বলা

মিথ্যা যা সত্যের বিপরিত। যারা মিথ্যার অপকারীতা বা ক্ষতি সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা মিথ্যাকে এমন ভাবে বলে থাকে যে, মিথ্যা বলা তাদের নিকট কোন ব্যাপারই নয়। মিথ্যা মানুষকে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করে। মিথ্যা বলতে বা মিথ্যা সাক্ষি দিতে ইসলাম আমাদেরকে নিষেধ করেছে।

মিথ্যা বলার ক্ষেত্রসমূহঃ

◈ অনেক সময় মিথ্যা বলা হয়: মানুষকে হাসানোর জন্য।

◈ অনেক সময় মিথ্যা বলা হয়: ঝগড়া-বিবাদে।

◈ অনেক সময় মিথ্যা বলা হয়: তর্ক-বিতর্কে।

◈ অনেক সময় মিথ্যা বলা হয়: এমন সব কাজে যা করাই হয় নাই।

◈ অনেক সময় মিথ্যা বলা হয়: এমন সব ঘটনায় যা সে দেখেই নাই।

◈ অনেক সময় মিথ্যা বলা হয়: এমন সব কথায় যা সে শুনেই নাই।

◈ অনেক সময় মিথ্যা বলা হয়: কোন কিছুর ওয়াদা করে, পরে তা ভঙ্গের মাধ্যমে।

এগুলো ছাড়াও যে কোন উপায়ে মিথ্যা বলা হউকনা কেন, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলা চলবেনা। কেননা মিথ্যা বলা হারাম, যা কবীরাহ্ গোণাহের অর্ন্তভূক্ত।

আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾ الحج: ٣٠

অর্থঃ সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বিরত থাক এবং বিরত থাক মিথ্যা কথা বলা থেকে। (সুরা হাজ্জ: ৩০) রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

قال ﷺ: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور.)) (متفق عليه)

অর্থঃ আমি কি তোমাদেরকে কবীরাহ গোণাহ্সমূহের মধ্যে বড় বড় কবীরাহ গোণাহের সংবাদ দিবনা ? (সাহাবাগণ বললেন: হ্যাঁ ইয়া রাসুলুল্লাহ) অত:পর তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, মিথ্যা কথা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। (বুখারী ৫৬৩২ মুসলিম ৭৮)

মিথ্যার অপকারিতাঃ

- ◈ মিথ্যার আশ্রয় নিলে আখেরাতে শাস্তি পেতে হবে।
- ◈ মিথ্যা ঈমানকে দূরিভূত করে দেয়।
- ◈ মিথ্যা সৎচরিত্রকে ধ্বংশ করে দেয়।
- ◈ মিথ্যা অপমান- অপদস্থ বাড়িয়ে দেয়।
- ◈ মিথ্যা আল্লাহর রাগান্বিত হওয়ার কারণ।
- ◈ মিথ্যা জাহান্নামে প্রবেশ হওয়ার কারণ।
- ◈ মিথ্যা সংশয় ও সন্দেহের কারণ।
- ◈ মিথ্যা বরকত দূরিভূত হওয়ার কারণ।
- ◈ মিথ্যা সাক্ষী মানুষের অধিকার হরণের কারণ।

এই সমস্ত অপকার ও ক্ষতি থেকে বাচতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই মিথ্যা বলা বা মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

সমকামিতা ও স্ত্রীর পিছনের রাস্তা ব্যবহার করা

সমকামিতা অর্থাৎ পুরুষে পুরুষে সঙ্গম করা। যা বর্তমানে দুনিয়াতে অন্যান্য জাতি সহ মুসলমানদের মধ্যেও ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলাম আমাদেরকে এই সমস্ত কর্ম-কান্ড থেকে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছে। এই সমস্ত অপকর্মের কারণে পূর্ববর্তী অনেক লোক ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ লুত (আঃ) এর সম্প্রদায়ের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴾ العنكبوت: ٢٩

অর্থঃ তোমরাইতো পুরুষে আসক্ত হচ্ছো, তোমরাই তো রাহাজানী করে থাকো এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করে থাকো। উত্তরে তারা বললো: আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ণ কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (সুরা আনকাবুত: ২৯)

সমকামিতার অপকারিতা:

- ◈ সমকামিতা কবীরাহ গোণাহের অন্তর্ভূক্ত।
- ◈ সমকামিতায় দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়।
- ◈ সমকামিতা মহামারী সহ এইড্স এর মত মারাত্মক ব্যধির জন্ম দেয়।

◈ সমকামিতা নিজের হালাল স্ত্রীর হক্ব আদায়ে দুর্বল করে দেয়।

◈ সমকামিতা সাস্থ্য নষ্টের বড় কারণ।

◈ যারা সমকামিতা করে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত।

◈ সমকামী ও যার সাথে করা হয় উভয়ের শাস্তি হচ্ছে হত্যা।

যদিও স্ত্রী স্বামীর জন্যে হালাল তবু হালালের পরিমান তথা কোন সময় কি কাজ করা হারাম তা কোরআন-হাদীস আমাদেরকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন। সুরা বাকারার ২২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ; তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আগমন কর যে ভাবে ইচ্ছে"।

পক্ষান্তরে সহবাসে পিছনের রাস্তা ব্যবহার করা হারাম করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "আল্লাহ ঐ ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন যে স্ত্রীর পিছনের রাস্তায় সহবাস করে"। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহম ও ইবনে হিব্বান)

স্বামী-স্ত্রী সহবাসের মধ্যে অনেকগুলো হেকমত রয়েছে তার মধ্যে একটি হেকমত হচ্ছে- স্ত্রীর গর্ভে সন্তান ধারণ করা। কিন্তু সহবাসে স্ত্রীর পিছনের রাস্তা ব্যবহার করলে সারা যিন্দেগীতেও সেই হেকমত বাস্তবায়ণ হবেনা। এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে এবং তা হবে স্ত্রীর উপর জুলুম যদিও সে তা সহ্য করে নেয়! আল্লাহ আমাদেরকে এই সমস্ত মহা পাপ থেকে বিরত রাখুন !

যিনা-ব্যভিচার

যিনা হচ্ছে- নিজের হালাল স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য মা-বোনদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হওয়া। একই কর্ম স্ত্রীর সাথে করা হালাল। আবার একই কর্ম ভিন্ন মহিলাদের সাথে করা কবীরাহ গুণাহের অন্তর্ভূক্ত। চাই তা মহিলার সম্মতিক্রমেই করা হউক বা জোর-জবরদস্ত করেই করা হউক।

অনেক যুবকের ধারনা হল: যদি ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সম্মতিতে সেই ফাহেশা কাজ করা হয়, তাহলে তা যিনা হিসাবে গণ্য হয় না। (নাউযুবিল্লাহ) ইহা মারাত্মক ভুল ধারণা। আবার অনেকে মনে করে বড় ভাইয়ের অনুপস্থিতে ছোট ভাই, বড় ভাইয়ের কাজ চালিয়ে যেতে পারে, ফলে সমাজে দেবর-ভাবীর মধ্যে অনায়াশে এই সমস্ত কুকর্ম চলে।

অনূরূপভাবে অনেক দুলাভাইয়েরা মনে করে বড় বোন বিয়ে করাতে শালী (অর্থাৎ স্ত্রীর ছোট বোন) তার জন্যে অর্ধেক হালাল হয়ে গিয়েছে। ফলে ফাঁকে ফাঁকে স্ত্রীকে রেখে শালীর সাথেও সেই অপকর্মে লিপ্ত হয়। (নাউযুবিল্লাহ) ঐ ধরণের দুলাভাই এবং যুবকদের সাথে কোন সম্পর্ক গড়া যাবে না বরং তাদের নিকট থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে।

আর সমাজে যাতে এই ধরণের কাজ না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এবং তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভয় দেখিয়ে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করতে হবে। আল্লাহ সকলকে যিনার মত ফাহেশা কাজের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ الإسراء: ٣٢

অর্থঃ তোমরা যিনা (ব্যভিচারের) কাছেও যেয়োনা, কেননা ইহা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। (সুরা বনী ইসরাঈল: ৩২) এবং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

وقال ﷺ: ((إذا زني العبد خرج منه الإيمان ..)) (رواه الترمذي ٢٦٢٥)

অর্থঃ বান্দা যখন যিনার কাজে লিপ্ত হয় তখন তার ঈমান বাহির হয়ে যায়। (তিরমিযী ২৬২৫)

যিনাকারী বা যিনাকারীনী উভয়ই সমান অপরাধি। যদি তারা বিবাহিত হয় তাহলে শরীয়তের বিধান হচ্ছে- পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা পক্ষন্তরে অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত করা (দোররা মারা)।

যিনার অপকারিতাঃ

◈ যিনার কারণে আল্লাহর মর্যাদা লঙ্ঘনে তাঁর ক্রোধ অর্জন হয়।

◈ যিনার কারণে চেহারা মলিন ও অন্ধকার হয়ে তার উপর বিষণ্নতা ও ঘৃণা প্রকাশ পায়।

◈ যিনার কারণে অন্তর কালো হয়ে যায় এবং তার মধ্যে হেদায়েতের আলো প্রবেশ করে না, অনূরূপ ভাবে অন্তর সংকির্ন হয়ে যায়।

◈ যিনার কারণে দারিদ্রতা অবধারিত হয়ে পড়ে।

◈ যিনার কারণে আল্লাহ ও জনগণের নিকট হেয়-প্রতিপন্ন হতে হয়।

◈ যিনার কারণে ফাসেক, ফাজের, যিনাকারী ইত্যাদী বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হয়।

◈ যিনার কারণে অন্তর থেকে ঈমান চলে যায়।

◈ যিনার কারণে কাল কিয়ামতের দিন শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং তাদের ভাগ্যে হুর জুটবেনা।

◈ যিনার কারণে এইড্‌স ও প্রমেহ রোগের মত অনেক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে হয়।

সব শেষে সংক্ষেপে একটি ঘঁটনা পেশ করছি- একবার বিয়াদ গেলাম বেড়াতে। গিয়ে দেখি এক হোটেলে মিষ্টি খাওয়ার ধুম পরেছে। জিজ্ঞাস করলাম কিসের মিষ্টি ? উত্তরে বলল: এক লোকের সৌদী আরবে আগমনের ছয় বছর পর সন্তান হয়েছে। বললাম এ কি করে সম্ভব ? বলল: তার ব্যবহৃত গামছার মাধ্যমে 'ফয়েজ' (অর্থাৎ সন্তান ধারণের বস্তু) পাঠিয়েছে। সেই গামছা স্ত্রী ব্যবহার করাতে তার সন্তান হয়েছে। এবার একটু চিন্তা করুন এই ধরণের ঘঁটনা আমাদের সমাজে আরো কত যে ঘটতেছে। তবু কেউ একটু ভেবেও দেখেনা। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত করুন।

সকল মু'মেন-মুসলমানের নিকট আকুল আবেন বিশেষ করে যুবক ভাইদের নিকট, আসুন ঐসমস্ত অপকর্ম থেকে বিরত থেকে অন্যান্য লোকদেরও বিরত রাখার চেষ্টা করি !

মদ পান করা

মদ বা শরাব হচ্ছে- এমন সব বস্তু যা খাইলে বা পান করলে জ্ঞান হারিয়ে যায় বা নেশাযুক্ত হয়ে পড়ে। এই সমস্ত বস্তু খাওয়া বা পান করা থেকে ইসলাম আমাদেরকে নিষেধ করেছে। আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾ المائدة: ٩٠

অর্থঃ হে মুমিনগণ ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারীর তীর এসব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়, সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক, যেন তোমাদের কল্যান হয়। (সুরা মায়িদাহ্: ৯০)

এবং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

قال ﷺ: ((كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)) (مسلم ٢٠٠٣)

অর্থাৎ প্রত্যেক নেশা জাতীয় জিনিসই হল মদ এবং প্রত্যেক নেশা জাতীয় জিনিসই হারাম। (মুসলিম ২০০৩) রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেছেন:

قال ﷺ ((كل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام)) (أحمد وأبوداؤد والترمذي)

অর্থাৎ প্রত্যেক নেশাযুক্ত জিনিসই হারাম এবং যার অধিক খাইলে নেশা হয় তার অল্পও হারাম। (আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাযী)

অতএব, বর্তমানে যে সমস্ত নেশা জাতীয় বিভিন্ন জিনিস, দেশে বিস্তার লাভ করেছে যেমন- মদ, শরাব, বাংলা, সাদা পানি, বীয়ার, অ্যাল-কোহল, অ্যার‍্যাক (তাড়ি), ভড্‌ক্যা, উইসকি, হেরোইন,

ইয়াবা, গাজা, জর্দা, জোতার আঠা, ইন্‌জেকশন ইত্যাদী যে কোন নামে বা যে কোন পদ্ধতিতে গ্রহন করা হউক না কেন; যা খাইলে বা পান করলে বা ঘ্রান নিলে বা শরীলে পুশ করলে নেশা হয়, তার অল্প বা অধিক সবই হরাম।

কেউ কেউ বলে থাকে তারা অল্প-সল্প খাইলে বা পান করলে নেশাযুক্ত হয়না, তাই এতে কোন অসুবিধা নেই। সেই নেশাখোরদের কথা কিছুতেই গ্রহন করা যাবেনা। কেননা সে ভক্ষন করতে করতে, অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে সে নেশাগ্রস্থ হয় না, তাই বলে যারা অভ্যস্ত নয় তারা খাইলে তাদের পরিস্থিতি কেমন হবে ?

নেশার অপকারিতাঃ

◈ মদ পানকারীদেরকে কাল কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের ঘাম ও শরীর থেকে নির্গত পুঁজ পান করানো হবে।

◈ মদপানকারীদের হাশর হবে মূর্তী পূজকদের সাথে।

◈ যে একবার মদ পান করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গৃহিত হয় না। আর এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান্নামী হবে।

◈ নেশা করলে জ্ঞান লোপ পায়।

◈ নেশা করলে মূলত: স্বাস্থের অবনতি ঘটে।

◈ নেশা করলে অর্থের অপচয় হয়।

◈ নেশা করলে সমাজে তাদের কোন সম্মান থাকেনা; বরং নীচু ও কমদামী লোকদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

এছাড়া আরো অনেক শারীরীক, আর্থিক ও সামাজিক ভাবে ক্ষতি সাধিত হয় বিধায় আমাদেরকে এই ধরণের মারাত্মক গুণাহের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

জুয়া খেলা

জুয়া নেশা জাতিয় বস্তু যা মানুষকে পাগল করে তুলে। যারা জুয়া খেলায় অভ্যস্ত তাদের নিকট টাকা-পয়সা না থাকলে, চুরি-ডাকাতি বা ছিনতাইয়ের মত মারাত্মক কাজে জড়িয়ে পড়ে। আরো শোনা যায় যে, জোয়ারীদের টাকা শেষ হয়ে গেলে হাতের ঘড়ি, চশমা, মুবাইল, জুতা, শার্ট, পেন্ট ইত্যাদী বিক্রি করে ফেলে। এমন কি শোনা গেছে জুয়া খেলায় নিজের স্ত্রী পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) এই ধরণের কাজ থেকে আল্লাহর নিকট পাণাহ চাচ্ছি। জুয়া ও লটারি এই দু'টি বিষয় পাশাপাশি, উদ্দেশ্যও প্রায়ই এক।

বর্তমানে জুয়া বা লটারির বিভিন্ন প্রকার বা ধরণ রযেছে। যেমন- (ক) তাসের মাধ্যমে জুয়া (খ) লুডুর মাধ্যমে জুয়া (গ) চাকি ঘুরানোর মাধ্যমে জুয়া (ঘ) রিং নিক্ষেপের মাধ্যমে জুয়া ইত্যাদী সহ আরো বিভিন্ন ধরণের জুয়া আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে। ঐসমস্ত জুয়া এবং লটারির কিছু প্রকার হারাম যা কবীরা গুণাহের অর্ন্তভূক্ত। লটারির বিভিন্ন প্রকার রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রশিদ্ধ হচ্ছেঃ

১) টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট একটি নাম্বার ক্রয় করা। অত:পর এই নাম্বারের ভিত্তিতে লটারি করে প্রথম পুরস্কার হিসাবে মোটা অংকের পুরস্কার দেওয়া, অনূরূপ ভাবে ২য়, ৩য়, ৪র্থ এইরূপে প্রথম দিকের পুরস্কারগুলো মূল্যবান দেওয়া, আর বাকী অংশগ্রহনকারীদের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা। এটা হারাম যদিও তাদের ধারনা অনুযায়ী এটাকে কল্যানকর কাজ বলে আখ্যায়িত করে।

২) অনূরূপ ভাবে সর্বপ্রকার বীমা চাই তা ব্যবসায়ীক বীমা হউক বা জীবন বীমা হউক বা গাড়ী, বাড়ী ও দোকান-পাটের উপর বীমা হউক, সকল প্রকার বীমা, জুয়া ও লটারীর অর্ন্তভূক্ত যা হারাম।

৩) অনূরূপ ভাবে বিভিন্ন খেলা-ধুলায় বাজি ধরাও হারাম। আল্লাহ ঐ সমস্ত জুয়া ও লটারী থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ ﴾ المائدة: ٩٠

অর্থঃ হে মুমিনগণ ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারীর তীর এসব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়, সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক, যেন তোমাদের কল্যান হয়। (সুরা মায়িদাহ্ ৯০)

অপকারিতাঃ

◈ লটারী ও জুয়া: অপবিত্র এবং মহাপাপের কাজ।

◈ লটারী ও জুয়া: শয়তানী কাজ যা মানুষকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখে।

◈ লটারী ও জুয়ায়: মানুষের মধ্যে শত্রুতা এবং হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে।

◈ লটারী ও জুয়ায়: মানুষের মধ্যে বেকারত্ব বৃদ্ধি করে।

◈ লটারী ও জুয়ায়: ধন-সম্পদ এবং মূল্যবান সময় নষ্ট করে।

◈ লটারী ও জুয়ায়: অপরাধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

◈ লটারী ও জুয়ায়: ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট করে।

এছাড়া আরো অনেক অপকার বয়ে আনে। বিধায় সকলকে এধরণের অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

চুরি ও ছিন্তাই করা

চুরি হচ্ছে- অন্যের মাল বা সম্পদ তার সংরক্ষিত স্থান থেকে নিজে মালিক হওয়ার উদ্দেশ্যে চুপি চুপি নিয়ে নেওয়াকে চুরি বলা হয়। এই চুরি সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের মধ্যে গভীরভাবে মিশে আছে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা চুরি করলে তা চুরি হিসাবে সাব্যস্ত হয়না, বরং অন্যান্য নামে আখ্যায়িত করা হয়, যেমন- বলা হয় দুর্নীতি, কালো টাকা, অবৈধ সম্পদ, আয়ের উৎস নেই ইত্যাদী। আর গরীবরা চুরি করলে, চোর বা চুরি বলেই আখ্যায়িত করা হয়।

বর্তমান সময়ে এমন পরিস্থিতি হয়ে গেছে যে, ছোট-খাট কোন বস্তু চুরি করলে তা চুরিই মনে করা হয় না। যেমন- না বলে কলম, চিরুনি, রোমাল, দু'টি পিয়াজ বা রসুন, ক্ষেত থেকে দুইটা কাচা মরিচ, টমেটু, বেগুন বা একটা লাউ ইত্যাদি নেওয়াকে সাধারণ বিষয় মনে করে, অনেক লোক এসমস্ত কাজগুলো অহরহ করে থাকে।

ঠিক তদ্রুপ রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, তবে এক সাথে চলাফেরা করে বা একই রুমে থাকে বিধায় না বলে একে অপরের অনেক কিছু ব্যবহার করে। যদি পরস্পরের অনুমতি না থাকে তাহলে তাও চুরি বলে গণ্য হবে। অনুরূপ ভাবে দোকান থেকে বা অন্য যে কোন জায়গা থেকে মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন কিছু নিলে তাও চুরি হিসাবে গণ্য হবে। চুরি করা কবীরা গুণাহের অন্তর্ভূক্ত। ইসলাম আমাদেরকে চুরি করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ ﴾ المائدة: ٣٨

অর্থঃ আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তোমরা তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে তাদের হাত কেটে ফেল, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, মহা প্রজ্ঞাময়। (সুরা মায়েদা: ৩৮) রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

قال ﷺ: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)) (متفق عليه)

অর্থঃ চুরের প্রতি আল্লাহর লা'নত! সে একটি ডিম চুরি করলে তার হাত কাটা হয়, এবং একটি রশি চুরি করলেও হাত কাটা হয়। (বুখারী ৬৪০১ মুসলিম ১৬৮৭)

ছিন্তাই ও ডাকাতিঃ

ছিন্তাই ও ডাকাতি চুরি থেকেও জঘণ্য কেননা এই দুইটি চুরির মত একই উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তা জনসম্মুখে তথা মানুষের চোখের সামনে করা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, বরং অনেক সময় মাল বা সম্পদ দিতে অস্বীকৃতি জানালে জীবনের ঝুকিও তাকে পোহাতে হয়। এদুটিও কবীরা গুণাহের মত মহা পাপের অন্তর্ভুক্ত।

ছিন্তাই বা ডাকাতির শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

المائدة: ٣٣

অর্থঃ যারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসুলের সাথে সংগ্রাম করে, আর পৃথিবীতে (ফাসাদ) অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হল, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা একদিকের হাত অপর দিকের পা কেঁটে দেওয়া হবে অথবা পৃথিবী থেকে বের করে দেওয়া হবে; এটা তো দুনিয়াতে তাদের জন্যে অপমান, আর পরকালেও তাদের জন্যে ভীষন শাস্তি রয়েছে। (সুরা মায়েদাহ: ৩৩)

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

أن رسول الله ﷺ قال: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك))

(رواه مسلم)

অর্থঃ যে কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক্ব নষ্ট করলো, আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নাম অবধারিত করে দিবেন এবং তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন। এক ব্যক্তি রাসুলকে বললেন: যদি সামান্যতম জিনিস হয় তবুও কি- ইয়া রাসুলুল্লাহ ? তিনি বললেন: যদি আরাক গাছের একটি ডালও হয়। (মুসলিম ১৩৭) (আরাক: এক ধরণের ছোট গাছ) তাহলে যারা বড় বড় দুর্নিতি বা ছিনতাই ও রাহাজানি করে থাকে তাদের কি পরিস্থিতি হবে একটু ভেবে দেখছেন কি ?

অপকারিতাঃ

◈ চুরি-ডাকাতি বা ছিন্তাইকারীদের উপর আল্লাহর লা'নত।

◈ চোরদের ইসলামী বিধান হচ্ছে- কব্জি পর্যন্ত হাত কেঁটে দেওয়া।

◈ চুরি-ডাকাতি বা ছিন্তাই এর মালে বরকত থাকেনা, ফলে যতই চুরি করে সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে।

◈ বে-হক্ব ভাবে কারো সম্পদ অত্মসাৎ করলে, পরবর্তীতে তার চেয়ে আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

আসুন! নিজেরা চুরি-ডাকাতি ও ছিন্তাইয়ের মত অপরাধ মূলক কাজ থেকে বিরত থাকি। এবং যারা ঐ সমস্ত কাজে নিয়োজিত তাদেরকে প্রশাসনের হাতে ধরিয়ে দেই।

পুরুষ মহিলার ও মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করা

আমাদের দেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে পুরুষ মহিলার বা মহিলা পুরুষের বেশধারণ করে থাকে। তাদের মধ্যে কতেক আছে যারা সর্বদাই একাজে নিয়োজিত। আবার কেউ কেউ আছে যারা বিভিন্ন অভিনয় বা ভাব-ভঙ্গিতে করে থাকে। যে কোন অবস্থায় একে অপরের বেশ ধরা হউকনা কেন; তা হবে কবীরা গুণাহের অন্তর্ভূক্ত।

পোশাকে বেশধারণ:

বেশধারণ পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে হউক যেমন- প্রত্যেক দেশেই নারী-পুরুষের পোষাকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এখন কেউ তার দেশের প্রথা অনুসারে পোষাক পরিধানে তার দেশের মহিলাদের নির্দিষ্ট পোষাক ব্যবহার করে। অনূরূপ কোন মহিলা তার দেশীয় পুরুষের নির্দিষ্ট পোষাক ব্যবহার করে।

কথা-বার্তায় বেশধারণ:

বেশধারণ কথা-বার্তা ও আচার ব্যবহারেই হউক যেমন- আল্লাহ পুরুষ ও মহিলাদের কথা-বার্তায় গলার আওয়াজ পার্থক্য করে দিয়েছেন। এখন কেউ তার আল্লাহ প্রদত্ব সাউন্ডকে পরিবর্তন করে মহিলাদের আওয়াজে কথা বলে থাকে বা কোন মহিলা পুরুষের আওয়াজে কথা বলে থাকে।

আকৃতিতে বেশধারণ:

বেশধারণ আকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমেই হউক যেমন- সাধারণত: আল্লাহ পুরুষ ও মহিলার আকৃতির মধ্যে সৃষ্টিগত বেশ পার্থক্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা সবারই জানা। তা সত্যেও কোন

মহিলা দাড়ি-মুছ লাগিয়ে, চুল খাট করে পুরুষের বেশধারণ করে, আবার অনেক পুরুষ দাড়ি-মুছ ক্লিন সেভ করে, চুল লম্বা রেখে মহিলাদের বেশধারণ করে থাকে। আবার অনেকে চোখে কাজল, ঠোটে লিপিষ্টিক, গালে লাল মেকাপ লাগিয়ে মহিলাদের বেশধারণ করে থাকে। যেভাবে যে পদ্ধতিতে একে অপরের বেশধারণ করুক না কেন; সবই মহা পাপের শামীল।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لعن رسول الله ﷺ((المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)) (رواه البخاري ٥٥٤٦)

وقال ﷺ : ((لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل)) (أبوداؤد ٤٠٩٨)

لعن رسول الله ﷺ ((المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء)) (رواه البخاري٥٥٤٧)

হাদীছ সমূহের অর্থঃ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) লা'নত করেছেন ঐ সমস্ত পুরুষদের যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে এবং ঐ সমস্ত নারীদের যারা পুরুষের বেশধারণ করে। (বুখারী ৫৫৪৬) রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেছেন: ঐপুরুষের উপর আল্লাহর লা'নত, যে নারীদের পোষাক পরিধান করে এবং ঐ নারীর উপর আল্লাহর লা'নত, যে নারী পুরুষের পোষাক পরিধান করে। (আবুদাউদ ৪০৯৮) সর্ব শেষ হাদীছে: রাসুল (ﷺ) ঐসমস্ত পুরুষদের প্রতি লা'নত করেছেন যারা নারীর বেশধারণ করে এবং ঐসমস্ত নারীদের প্রতি যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে। (বুখারী ৫৫৪৭)

অপকারিতাঃ

◈ নারী পুরুষের বা পুরুষ নারীর বেশধারণ করা কবীরা গুণাহের অন্তর্ভূক্ত।

◈ নারী পুরুষের বা পুরুষ নারীর বেশধারণ কারীদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের লা'নত হয়।

◈ নারী পুরুষের বা পুরুষ নারীর বেশধারণ করা অন্য লোকদের ধোকা দেওয়ার শামীল।

◈ নারী পুরুষের বা পুরুষ নারীর বেশধারণ করা অর্থ-সম্পদ অপচয়ের কারণ।

সকল পাঠকের নিকট আবেদন আসুন! এই সমস্ত লা'নতদারী কাজ থেকে নিজেরা বিরত থাকি এবং নিজেদের কোন ছেলে-মেয়ে বা আত্মীয়-স্বজন যাতে না করতে পারে সেদিকে কড়া নজর রাখি!!

খেয়ানত করা

খেয়ানত শব্দের অর্থ হচ্ছে- বিশ্বাসঘাতকতা, বিশ্বাসভঙ্গ, অবিশ্বাস ইত্যাদী। আর তা যে কোন প্রকারেরই খেয়ানত করা হউকনা কেন।

খেয়ানতের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে-

◈ আল্লাহর সাথে খেয়ানত করা। যেমন- আল্লাহর যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে অমান্য করে নিজের খেয়াল-খুশী মত চলা।

◈ রাসুলের সাথে খেয়ানত করা। যেমন- তাঁর আদেশ-নিষেধ ও হেদায়েতের পূর্ণ আনুগত্য না করা এবং তাঁর সুন্নাতসমূহে বিদআত বৃদ্ধি করা।

◈ নিজের আত্মার সাথে খেয়ানত করা। যেমন- নিজের দেহের পূর্ণ হক্ব আদায় না করা।

◈ আমানতের খেয়ানত করা। কেউ কারো নিকট কোন কিছু আমানত রাখল পরে তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানানো।

◈ ধর্মে খেয়ানত করা। যেমন- পূর্ববর্তী মুনাফেকরা করেছিল। বর্তমানেও তাদের অনেক অনুসারী রয়েছে। তারা সম্মুখে প্রকাশ করে এক ধরণের কথা, পশ্চাতে প্রকাশ করে ভিন্ন ধরণের কথা।

◈ ব্যক্তিগত আমানতে খেয়ানত করা। যেমন- একক কোন আমানতের খেয়ানত করা।

◈ জনসাধারণের আমানতে খেয়ানত করা। যেমন- বর্তমানে মেম্বার, চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রিয় পর্যায়ে পর্যন্ত হয়ে থাকে।

◈ স্বামী স্ত্রীর বা স্ত্রী স্বামীর খেয়ানত করা। যেমন- পরস্পরের যে হক্ব রয়েছে তা আদায় না করা। পরস্পরের মধ্যকার গোপন কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করা।

◈ পিতা-মাতার হক্ব আদায় না করে তাদের খেয়ানত করা।

◈ সন্তান-সন্ততির ও পরিবার-পরিজনের হক্ব আদায় না করে তাদের খেয়ানত করা।

◈ ধন-সম্পদে খেয়ানত করা ইত্যাদী।

এছাড়াও অরো অনেক রকমের খেয়ানত হতে পারে। সকল প্রকার খেয়ানত থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে।

আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾ الأنفال: ٢٧

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে খেয়ানত করবে না, আর তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত সম্পদেরও খেয়ানত করবে না।(সুরা আনফাল: ২৭)

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

قال ﷺ ((أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتي يدعها: إذا ائتمن خان ...)) (متفق عليه)

অর্থঃ চারটি স্বভাব যার মধ্যে রয়েছে সে খাঁটি মুনাফেক। আর ঐ চারটির মধ্য থেকে যার মধ্যে একটি স্বভাব রয়েছে, তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব আছে, যতক্ষন পর্যন্ত সে তা পরিত্যাগ না করে। বুখারী মুসলিম)

খেয়ানতের অপকারিতাঃ

- ◈ খেয়ানত করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল নিষেধ করেছেন।
- ◈ খেয়ানত করা মুনাফেকের একটি আলামত।
- ◈ খেয়ানত মানুষের হক্ব নষ্ট করে।
- ◈ খেয়ানত করা কবীরা গুণাহের অন্তর্ভূক্ত ইত্যাদী।

মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া ও গালিগালাজ করা

কোন মুসলমানের জন্যে উচিত নয় যে, সে অপর মুসলমানকে অনর্থক-অযথা কষ্ট দিবে বা গালিগালাজ করবে। যে কোন পর্যায়ে কষ্ট দেওয়া হউক না কেন। কষ্ট দেওয়ার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে।

আর্থিক কষ্ট:

যেমন- কেউ কারো টাকা-পয়সা বা সম্পদ ধার নিয়ে তা ফিরিয়ে না দেওয়া। অনূরূপ ভাবে কারো অর্থ বা সম্পদ অন্যায় ভাবে আত্মসাত করা ইত্যাদী।

মানষিক কষ্ট:

যেমন- কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার ও ইশারা-ইংগিতের মাধ্যমে একে অপরকে কষ্ট দিয়ে থাকে। যাতে করে সে আন্তরিক ভাবে দুঃখ পায়।

সামাজিক মান-সম্মানে কষ্ট:

যেমন- সমাজে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি রয়েছে যারা গরীবদেরকে সু-নজরে দেখে না, তাদেরকে সম্মান করে না, অনেক কাজ-কর্মে তাদেরকে গণনায় ধরা হয় না। আবার অনেক স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী ব্যাক্তিরা দুর্বলদেরকে কোন মূল্যায়ন করে না ইত্যাদী।

ধর্মীয় কষ্ট:

যেমন- সমাজে অনেক লোক আছে যারা নিজেরা আমল করে না, পক্ষান্তরে যারা আমল করে তাদের কে কটুক্তিমূলক কথা বলে থাকে। অনেক সময় লোকদেরকে উছকানিমূলক কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন এবাদত করতেও বাধা দেওয়া হয়ে থাকে।

আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ الأحزاب: ٥٨

অর্থঃ মুমেন পুরুষ ও মুমেন নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করবে। (সুরা আহযাব: ৫৮)

এবং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

قال ﷺ: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) (متفق عليه)

অর্থঃ কোন মুসলমানকে গালিগালাজ করা ফাসেকী এবং কাউকে হত্যা করা কুফরী। (বুখারী ৪৮ মুসলিম ৬৪)

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেছেন: এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই ভাই, কেউ কাউকে অত্যাচার করবেনা, ক্ষতি সাধন করবেনা, অপমান অপদস্ত করবেনা, বরং কেউ কারো প্রয়োজনে এগিয়ে আসলে; আল্লাহ তার প্রয়োজনে এগিয়ে যাবেন। বিধায় কোন মুসলমানের উচিত নয় অপর মুসলমানকে অযথা-অনর্থক কষ্ট দেওয়া বা গালি-গালাজ করা। বরং রাসুল (ﷺ) সকল মুসলমানদেরকে এক প্রাচীরের ন্যায় মজবুত ও একতাবদ্ধ হয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল বলেন:

এক মু'মেন অপর মু'মেনের জন্য প্রাচীর স্বরূপ; একে অপরকে মজবুত করে তোলে।

অপকারিতাঃ

◈ মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া বা গালিগালাজ করা জায়েয নয় বরং তা কবীরা গুণাহের অন্তর্ভূক্ত।

◈ মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া বা গালিগালাজ না করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়।

◈ মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া বা গালিগালাজ করা ফাসেকী কাজ।

◈ মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া বা গালিগালাজ করা তাদেরকে অপবাদ দেওয়া সমতুল্য।

◈ মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া বা গালিগালাজ অপর ভাইয়ের মান-সম্মানে আঘাত করা।

◈ যারা মুসলমানদের কষ্ট দেয় বা গালিগালাজ করে কেয়ামতের দিন তাদের স্থান হবে মন্দ লোকদের সাথে।

◈ অনুরূপ ভাবে আল্লাহর নবী মৃত ব্যক্তিদেরকেও গালিগালাজ করতে নিষেধ করেছেন।

মাপে ও ওজনে কম দেওয়া

মাপ হচ্ছে- যা লিং, মিটার, ইঞ্চি বা গজ দিয়ে মাপা হয়। যেমন- জায়গা-জমি লিং দিয়ে মাপা হয়, কাপড়-চোপড় মিটার বা গজের সাহায্যে মাপা হয়ে থাকে অনুরূভাবে অল্প-সল্প জিনিস ইঞ্চি বা মিলিমিটার দিয়ে মাপা হয়

ওজন হচ্ছে- যা কেজি, সের বা ওজনের পাত্র দিয়ে মাপা হয় যেমন- চাল, ধান, গম, আটা ইত্যাদী।

মাপের এই দুই পদ্ধতিতেই কম দিয়ে ক্রেতাকে ঠকানো সম্ভব বিধায় অধিকাংশ ব্যবসায়ীগণ তাদের ব্যবসায় এসমস্ত কাজ করে থাকে। তারা কোন জিনিস ক্রয় করে নেওয়ার সময়, মাপ বা ওজনে পরিপূর্ণ আনে, এমনকি অনেক সময় বেশী আনতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিক্রি করে দেওয়ার সময় কম দিয়ে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাসী লোকদের কর্তব্য এইসমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকা। যারা মাপে বা ওজনে কম দেয় তাদের পরিনতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ المطففين: ١ - ٣

অর্থঃ মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকদের নিকট থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহন করে। এবং যখন তাদেরকে মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। (সুরা মুতাফফিফীন: ১-৩)

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ব্যবসায় সর্ব প্রকার ধোকা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। মাপে বা ওজনে কম দেওয়া ব্যবসায় ধোকার অন্তর্ভূক্ত।

মাপে বা ওজনে কম দেওয়ার অপকারিতাঃ

◈ মাপে বা ওজনে কম দেওয়া কবীরা গুণাহের অন্তর্ভূক্ত।

◈ মাপে বা ওজনে কম দেওয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসুলেকে অমান্য করার শামিল।

◈ মাপে বা ওজনে কম দিলে ব্যবসায় আয়-উন্নতি ও বরকত হয়না।

◈ মাপে বা ওজনে কম দেওয়া ব্যবসায় ক্ষতি এমনকি ব্যবসা ধ্বংশ হয়ে যাওয়ার কারণ।

◈ মাপে বা ওজনে কম দিলে কিয়ামতের দিন তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

◈ মাপে বা ওজনে কম দিলে বন্ধুত্ব ও কাষ্টমার নষ্ট হয়।

◈ মাপে বা ওজনে কম দিলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়।

◈ মাপে বা ওজনে কম দেওয়াতে পূর্ববর্তী অনেক লোক ধ্বংশ হয়ে গিয়েছে।

বিধায় সকল বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীক ভাইদের নিকট অনুরোধ থাকল যে, ব্যবসায়ে কোন প্রকার ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।

কাজে ফাঁকি দেওয়া

মৃত্যুর পরে প্রত্যেকটি মানুষকেই তার কৃত কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। প্রত্যেকের যাবতীয় কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, দেখা-শুনা সবই তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। ফলে আজকে দুনিয়াতে যা কিছু করতেছি, তা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করার কোন উপায় নাই।

অফিস-আদালত, দোকান-পাঠ, ক্ষেত-খামার সহ অন্যান্য কাজে অনেক কর্মী বা চাকরিজীবিদেরকে দেখা যায়, তারা কাজে ফাঁকি দিয়ে থাকে। যেমন-

(ক) সময় মত ডিউটিতে আসে না।

(খ) ডিউটির সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই ডিউটি থেকে চলে যায়।

(গ) ডিউটির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজ না করে অযথা সময় নষ্ট করে দেয়।

(ঘ) ব্যক্তিগত কাজে এদিক-সেদিক ঘুরা-ফেরা করে ইত্যাদী।

এছাড়াও যে কোন পদ্ধতিতে কাজে ফাঁকি দেওয়া হউক না কেন, অবশ্যই তাকে আল্লাহর সামনে ফাঁকিবাজ হিসাবে দাড়াতে হবে। হয়তো দুনিয়াতে মালিক বা পাটনার কে নয়-ছয় করে বুঝানো যাবে, কিন্তু এর জন্য কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হতে হবে। কেনা-বেচায় ধোকার প্রবনতার শেষ নেই, তবে কাজে ফাঁকি দেওয়াও কম চলেনা। যার ধরণ আমরা একটু পূর্বেই বর্ণনা করেছি। যে কোন বিষয়ে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ধোকা, নকল, ভেজাল ইত্যাদী দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য রাসুল (ﷺ) আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন। রাসুল (ﷺ) বলেন:

قال ﷺ: ((من غشنا فليس منا)) (مسلم١٠١)

অর্থঃ যে আমাদের কে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়। (মুসলিম ১০১)

অপকারিতাঃ

◈ কাজে ফাঁকি দেওয়া গুণাহের কাজ।

◈ কাজে ফাঁকি দেওয়া হারাম।

◈ কাজে ফাঁকি দেওয়ায় মালিক কর্ম-চারী উভয়ের ক্ষতি।

◈ কাজে ফাঁকি দিলে ঐ কাজে বরকত হয়না।

◈ কাজে ফাঁকি দিলে সমাজে ফাঁকিবাজ হিসাবে পরিচয় লাভ করে।

◈ কাজে ফাঁকি দিয়ে বেতন নেওয়া জায়েয নয়।

◈ কাজে ফাঁকি দেওয়া আমানতের খেয়ানত করা।

যার মধ্যে তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহ ভীতি কম বা নেই বললেই চলে, ঐ সমস্ত লোকেরা কাজে ফাঁকি দিতে একটু পরোয়াও করে না। অন্যেরাও মাঝে মধ্যে দিয়ে থাকে। তাই সকলের জন্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করি- আল্লাহ যেন, সকলকে হেদায়েত দান করেন!

মাহ্‌রাম নয় এমন মহিলার সাথে একাকী হওয়া

মাহরাম নয় বলতে বুঝানো হয়েছে ঐ সমস্ত মহিলা যাদের সাথে বিয়ে জায়েয়, দেখা দেওয়া হারাম। এমন সব মহিলাদের সাথে কোন একজন পুরুষের, চলা-ফেরা বা একাকী অবস্থান করা যায়েয নয়। তবে যারা মাহরাম অর্থাৎ যাদের সাথে বিয়ে হারাম, দেখা করা জায়েয তাদের সাথে একাকী অবস্থান করাতে কোন দোষ নেই।

একাকী হওয়ার কিছু চিত্রঃ

যেমন- কোন চালক একাকী কোন মহিলাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া। চাই তা বেবী-টেক্সি, গাড়ি, নৌকা, রিক্সা ইত্যাদী যাই হোক না কেন। অনূরূপ ভাবে কোন বাসা-বাড়ী, দোকান-পাঠ, মাঠ-ঘাট, বাজার-বন্দর, গ্রাম-শহর, পার্ক-রেস্তোরা যেখানেই একাকী হউক না কেন। একজন পুরুষ যখন বেগানা কোন মহিলার সাথে নির্জনে আলাদা হয়, তখন তাদের উভয়ের মধ্যে শয়তান ঢুকে তাদেরকে খারাপ কাজের কুমন্ত্রনা দিয়ে অনেক ধরণের ফাহেশার কাজে নিয়োজিত করে ফেলে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদেরকে বেগানা মহিলার সাথে একাকী হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। রাসুল (ﷺ) বলেছেন:

قال ﷺ : ((لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)) (الترمذي ١١٧١) وقال ﷺ:

((لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو إثنان)) (مسلم ٢١٧٣)

অর্থঃ যখনই কোন পুরুষ ভিন্ন কোন মহিলার সাথে নির্জন হয় তখন তাদের মধ্যে তৃতীয় জন হয় শয়তান। (তিরমিযী ১১৭১) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে 'আজকের দিনের পর থেকে কোন পুরুষ একাকী ঐ সমস্ত মহিলাদের ঘরে ঢুকতে পারবেনা যাদের স্বামী বাড়িতে উপস্থিত নেই। যতক্ষন পর্যন্ত তার সাথে অন্য একজন বা দুইজন না থাকবে। (মুসলিম ২১৭৩)

অপকারিতাঃ

◈ মাহরাম নয় এমন মহিলার সাথে একাকী হওয়া মহা পাপের অন্তর্ভূক্ত।

◈ মাহরাম নয় এমন মহিলার সাথে একাকী হলে শয়তান খারাপ কাজের পরামর্শদাতা হয়ে যায়।

◈ মাহরাম নয় এমন মহিলার সাথে একাকী হওয়া ফাহেশা কাজে লিপ্ত হওয়ার বড় কারণ।

◈ মাহরাম নয় এমন মহিলার সাথে একাকী হলে একজন অপরজনকে মমের মত গালিয়ে ফেলে।

◈ মাহরাম নয় এমন মহিলার সাথে একাকী হওয়া দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাড়ায়।

◈ মাহরাম নয় এমন মহিলার সাথে একাকী হওয়া পরকিয়া প্রেমের শুরু।

কোন অবস্থাতেই একজন পুরুষকে ভিন্ন একজন মহিলার সাথে একাকী হতে দেয়া যাবে না। সেই মহিলা যে কোন দেশেরই হউক না কেন।

গান-বাজনা শোনা

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) কে গান শোনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ- গান শোনা হারাম এবং ইহা নিকৃষ্ট কাজ। এবং তা অন্তরের পীড়া, কঠোরতা, আল্লাহর স্বরণ ও নামায থেকে দূরে ফেলে রাখার উপায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ﴾ لقمان: ٦

অর্থঃ "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর পথ হইতে মানুষকে বিচ্যুত করবার জন্যে অসার বাক্য ক্রয় করে নেয়"। (সুরা লুকমান: ৬)

অধিকাংশ আলেমগন এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন- অসার বাক্য মানে, গান শোনা। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস কসম করে বলেছেন- 'লাহওয়াল হাদীস' মানে গান। আর যদি গানের সাথে বাজনা থাকে যেমন:- দোতারা, বীণা ইত্যাদী তাহলে আরো কঠিনতর হারাম হবে। অতএব ওয়াজিব হচ্ছে- উহা থেকে বিরত থাকা।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সহীহ বর্ননায় এসেছে- তিনি বলেছেন- 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক হবে যারা জিনা, মদপান, রেশম পরিধান ও গান-বাজনা কে হালাল মনে করবে' (বুখারী)। বিধায় সকল লোকদের এই সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করে কোরআন তেলাওয়াত ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানাদী শোনার উপদেশ গ্রহণ করুন এবং গান-বাজনা শোনা থেকে বিরত থাকুন।

বিবাহের সংবাদ মানুষের কানে পৌছিয়ে দেওয়ার জন্যে এবং বিবাহ ও অবৈধ যৌনকর্মের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে, বিবাহের অনুষ্ঠানাদিতে এক প্রকার তবলা, যার এক সাইড খোলা থাকে এবং হাতে বহন করে বাজানো হয়, তার সাথে রাতে শুধু মহিলাদের জন্যে ঐ ধরনের গান জায়েয আছে, যার মধ্যে হারাম কোন কথা বা হারামের দিকে আহ্বান করা বা হারাম কাজের প্রশংসা করা ইত্যাদী নেই . যেমন নবী করীম (ﷺ) থেকে সহীহ ভাবে প্রমানিত হয়েছে।

এবং ঢোল বাজানো বিয়ের আসরেও জায়েয নয়। বরং শুধু তবলার উপরই যথেষ্ঠ রাখতে হবে। অনুরূপ ভাবে বিয়ের অনুষ্ঠানাদীতে মাইক, ডেক-সেট বা টেপ রেকর্ডার ও বিভিন্ন ধরনের গান বাজনা ব্যবহার করা জায়েয নয়। যাতে রয়েছে মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া সহ বড় ধরনের ফেৎনা ফাসাদ।

নিম্মে সলফে সালেহীনদের কিছু দলীল-প্রমানাদী উল্লেখ করা হল-

◈ আবু বকর (ﷺ) বলেন- গান-বাজনা শয়তানের বাঁশী।

◈ ইমাম মালেক বিন আনাছ (ﷺ) বলেন- আমাদের মধ্যে যারা ফাসেক কেবল মাত্র তারাই গান-বাজনা করে।

◈ শাফী' মাজহাবের লোকেরা গান-বাজনাকে বাতিল ও অনর্থক কাজের সাথে তুলনা করেছেন।

◈ ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন- আমি গান-বাজনা পছন্দ করিনা, কেননা তা অন্তরে নিফাক্ তৈরী করে।

◈ ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর সাথীগণ বলেন- গান শোনা ফাসেকী।

◈ ওমর ইবনে আব্দুল অযীয বলেন- গানের উৎপত্তি শয়তান থেকে, এবং তার পরিনাম হল আল্লাহর ক্রুদ্ধ।

◈ ইমাম কোরতুবী বলেন- গান শোনা কোরআন হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ।

◈ ইমাম সালাহ বলেন- সকল উলামাগনের ঐক্যমতে গান শোনা হারাম।

আমাদের দেশে কিছু ভন্ড পীর-ফকির ও লম্বা চুল ওয়ালা গায়ক রয়েছে, যারা তাদের গানে বলে থাকে (কোন কিতাবে লেখা আছে গান-বাদ্য হারাম)।

ঐদিকে আমাদের মধ্যে কিছু মূর্খ রয়েছে যারা তাদের ঐ কথাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু একবার চিন্তা-ভাবনাও করে দেখেনা যে, সে একজন গায়ক। যার ভিতরে কোরআন-হাদীছের কিছুই নেই, তবু একজন মুফ্‌তি সেজে ঐধরণের ফতোয়া দিচ্ছে সেই ফতোয়া আমি কি ভাবে গ্রহণ করছি।

সে যদি প্রকৃত কোন আলেম হত বা তার মধ্যে কোরআন-হাদীছের কোন জ্ঞান থাকতো, তাহলে সে নিজেই গান-বাজনা করতো না, আর মানুষদেরকে ঐ ধরণের ফতোয়াও দিত না। কেননা একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মসজিদের কোন ঈমাম বা মাদ্রাসার কোন উস্তাদ বা অন্যান্য বড় বড় আলেম-উলামা নিজে গান-বাজনা করেন ও লোকদেরকে করার ফতোয়া দেন।

অতএব স্পষ্ট প্রমান হচ্ছে যে, যারা গান-বাদ্য করে এবং অন্যদেরকে ফতোয়া দেয় তারা নিজেরাই মুর্খ। আল্লাহ আমাদেরকে ঐধরণের মূর্খ ও গোমরাহীদের নিকট থেকে বিরত রাখুন!

শরীর ও পোষাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ঈমানের অঙ্গ'। জামা-কাপড়, শরীর, গাড়ি-বাড়ী, অফিস-আদালত সহ নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যহারিক যাবতীয় জিনিস-পত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বিশেষ করে নামাযের সময়, কেননা আমাদের অভ্যাস হচ্ছে- কোথাও বেড়াতে গেলে বা কারো সাথে দেখা করতে চাইলে সুন্দর ভাবে সেজে-গোজে যাই। যেমন- বেয়াইর বাড়ি বা গণ্য-মান্য লোকের (মেম্বার, চেয়ারম্যান) সাথে দেখা করতে গেলে নতুন জামা পরিধান করে অথবা জামাটা ধুইয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে, সম্ভব হলে লন্ড্রি করে ভালবাবে সেজে-গোজে যাই।

কিন্তু যখন নামায আদায় করতে মসজিদে যাই, তখন ছেড়া বা নোংড়া গেঞ্জি অথবা গামছা কাঁধে ঝুলাইতে ঝুলাইতে চলে যাই। এবং সেই গামছা বা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে নামায আদায় করে থাকি। একবার চিন্তাও করি না যে, সেই বেয়াই বা মেম্বার-চেয়ারম্যানের সম্মান বড়, না আল্লাহর সম্মান বড় ? যদি আল্লাহকেই বেশী সম্মানী মনে করতাম; তাহলে আল্লাহর সামনে নামাযে দাড়ানোর জন্যে গামছা আর গেঞ্জি নিয়ে চলে যেতাম না। বরং উত্তম পোশাক পরিধান করে যথাসম্ভব সু-গন্ধি লাগিয়ে মসজিদে হাজির হতাম।

মসজিদে উত্তম পোশাক পরিধান করে যাওয়ার জন্যে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ﴾ الأعراف: ٣١

অর্থঃ হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ কর। (সুরা আ'রাফ: ৩১)

সতর্ক:

যদিও জামা-কাপড় পাক থাকলে যে কোন কাপড়েই নামায আদায় করা জায়েয আছে, তবু কাপড়টি পবিত্রতার সাথে সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া উত্তম।

অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভাইদেরকে দেখা যায় ডিউটির পোশাক পরে কাজে যায় এবং নামাযের সময় হলে ঐ পোশাকেই নামায আদায় করতে মসজিদে চলে যায়। ডিউটির পোশাক নোংড়া হওয়ার কারণে, অনেক সময় কোন কোন মসজিদে জায়নামায ব্যবহার করলেও শরীল ও জামা-কাপড় থেকে যে, দূর্গন্ধ বাহির হয় তা অন্যান্য মুসল্লি ও ফেরেস্তাদের কষ্ট দেয়। যদিও ডিউটির কাপড় পবিত্র থাকলে তাতে নামায আদায় করা জায়েয আছে তবু কয়েকটি পরামর্শ দিচ্ছি-

পরামর্শঃ

◈ **১ম পরামর্শ হচ্ছে-** কোন অবস্থাতেই নামায পরিত্যাগ করার চেষ্টা করবেন না।

◈ **২য় পরামর্শ হচ্ছে-** শরীর ও কাপড় পাক-পবিত্র রাখার চেষ্টা করবেন। যাতে করে নামাযের সময় বলতে না হয় যে, শরীল ভাল না বা কাপড় ভাল না, কেননা এই সমস্ত আপত্তি আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্য হবে না।

◈ **৩য় পরামর্শ হচ্ছে-** আপনি যেখানে কাজ করেন অর্থাৎ কর্মস্থলে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা এনে রাখবেন, যাতে করে নামাযের সময় ডিউটির জামাটা পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই জামাটা পরিধান করে নামায আদায় করতে পারেন। এতে করে অন্যান্য

মুসল্লিদের কাছে নিজেকে ছোট মনে হবে না ও আপনার মনটাও প্রফুল্য থাকবে এবং আল্লাহও খুশী হবেন।

◈ **৪র্থ পরামর্শ হচ্ছে-** শরীরটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন এবং যার যার সাধ্য অনূসারে কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, কেননা স্বাস্থ্যই সকল কিছুর মূল।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট কামনা তিনি যেন আমাদেরকে কোরআন ও সহীহ্ হাদীছের উপর পরিপূর্ণ ভাবে আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন !!

সমাপ্ত

مقدمة

الحمد لله الذي فضلنا بنعمه وكرمه وأعاننا بتأليف كتاب ((التنبيهات الهامة)) وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

لِما رأيناه من بعض إخواننا المسلمين من الوقوع في بعض الاعتقادات والمفاهيم الخاطئة المنتشرة، فقد أعددنا هذا الكتاب موضحا وموافقا للزمان والمكان، حيث جمعتُ فيه بعض المواضيع التي يقع فيها الناس عن قصدٍ أو غير قصد، ظنّا منهم لبعض المحرمات أنها حلال ولبعض الأخطاء أنها صحيحة، ولبعض الأشياء الممنوعة أنها جائزة وغيره، فالبعض منهم يفعلون هذه الأشياء جهلاً والبعض الآخر على حسب أهوائهم

ولذا فإن هذا الكتاب يُنبِّه عن هذه الأشياء الخاطئة ثم يصحح مفهوم قارئه و يصحح بذلك أهله ومجتمعه إن شاء الله، وذكرتُ بعض الأحكام والفوائد المتنوعة على ضوء الكتاب والسنة و قصص وأقوال سلف هذه الأمة.

وأخيراً أشكر الله عز وجل ثم أشكر المهندس عبد الله بن دخيل الله الحارثي (مشرف مندوبية جنوب الطائف للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات) على حثه لنا لتأليف مثل هذا الكتاب، وأشكر أخونا محمد هارون حسين لمراجعة الكتاب، وأشكر الإخوان المحسنين الذين قاموا بطباعته وتوزيعه، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، سائلين من المولى عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب

والله من وراء القصد ، ، ،

مقدمه

أبوب الرحمن سفير الدين

© المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف ، ١٤٢٩هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
سفير الدين ، أيوب عبد الرحمن
التنبيهات الهامة عن مسائل مهمة في حياة المسلم – البنغالية./
أيوب عبد الرحمن سفير الدين – الرياض ، ١٤٢٩هـ
..ص؛ ..سم
ردمك : ٧ – ٩ – ٩٢٢٩ – ٩٩٦٠ – ٩٧٨
١-الإسلام – مجموعات أ. العنوان
ديوي ٨ .٢١٠ ٦٠٤٥ / ١٤٢٩
رقم الإيداع : ٦٠٤٥ / ١٤٢٩
ردمك : ٧-٩-٩٢٢٩-٩٩٦٠- ٩٧٨

التنبيهات الهامة

عن مسائل مهمة في حياة المسلم

باللغة البنغالية

إعداد :

أيوب الرحمن بن سفير الدين

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف

مندوبية جنوب الطائف ت/٧٤٠٢٢٢٣ ف/٧٤٠٦٦٠٦